পাহাড়ে আলো জ্বলে

পাহাড়ে আলো জ্বলে

দেবল দেববর্মা

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
দেবব্রত বক্সী
অলঙ্করণ :—
সরোজ সরকার

প্রথম প্রকাশ
১০ই চৈত্র
১৩৬৮
ইং ১৯৬১

শ্রীমান স্বর্ণাভ ঘটক (পলাশ)

স্নেহাস্পদেষু—

'পাহাড়ে আলো জ্বলে' কোনও বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদ কিংবা ছায়াবলম্বনে লেখা নয়। তবে এক বাণিজ্যিক জাহাজের ক্যাপ্টেনের মুখে আরব সমুদ্রের এমনি এক গল্প শুনেছিলাম।

তোমরা যারা বিজ্ঞান পড় অথবা প্রলয়ের মতো অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পাগল, এই রহস্যঘন দুঃসাহসিক কাহিনী হয়তো তাদের ভালো লাগবে।

এই লেখকের বই—

নিখোঁজ রতন (রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক নির্বাচিত গ্রন্থ)

এক

খড়্গপুরে যাওয়ার কথা শুনে সুশান্ত প্রথমে নাক সিঁটকেছিল।

ধোৎ! কলকাতা থেকে এত কাছে, যেন এ-পাড়া ও-পাড়া। এবেলা গিয়ে ওবেলা ফিরে আসা যায়। আশ্বিন মাসে পুজোর ছুটি হলে বাবা বললেন, 'বইটা ভালো করে পড়। তাহলে এগজামিনেশন শেষ হলে নিশ্চয় কোথাও পাঠিয়ে দেব।'

অ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ হতেই সুশান্ত বায়না ধরল, সে এবার ছোট পিসির বাড়ি যাবে। ছোট পিসি অর্থাৎ অপর্ণা থাকে হায়দ্রাবাদে। কিন্তু সুশান্তকে ওই অতদূরে রেখে আসতে লোক কোথায়? তা ছাড়া মা একরকম বেঁকে বসল। ওই দুরন্ত ছেলেকে হায়দ্রাবাদে পাঠিয়ে সে একটা রাত্তিরও শান্তিতে ঘুমোতে পারবে না। সুশান্ত অবশ্য জানত, বাবা যখন কথা দিয়েছে তখন সেটা ফাইন্যাল। নিশ্চয় কোথাও পাঠাবে, তার নড়চড় হবে না। কিন্তু তাই বলে খড়্গপুর? মোটে দু-ঘণ্টার রাস্তা। কোথায় হায়দ্রাবাদ? কত বড় নদী, গোদাবরী, মহানদী সব পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। তার বদলে কিনা খড়্গপুর? এ যেন চন্দ্রে যাওয়ার প্ল্যান ভেস্তে দিয়ে চন্দ্রকোণায় যাওয়া হচ্ছে।

খড়্গপুরে অবশ্য একটা আকর্ষণ আছে। তার মাসতুতো ভাই প্রলয়। তার মতো অ্যানুয়াল পরীক্ষা দিয়েছে। পাস করে দু'জনেই ক্লাস টেন-এ উঠবে। ছেলেটা যে বইয়ের পোকা, দিন-রাত্তির পড়াশুনোর মধ্যে ডুবে থাকে ঠিক তা নয়। তবে সর্বক্ষণ কী যেন ভাবে। কিছু একটা বানাবে, এই চিন্তাতেই মশগুল হয়ে আছে। এই তো গত সামার ভেকেশানে যখন কলকাতায় এসেছিল, তখন তাদের বাড়িতে একটা নতুন জিনিস তৈরি করে দিল।

সুশান্তদের চারতলার ফ্ল্যাট। অথচ লেটার বক্সটা একতলায়। পিওন কখন চিঠি গলিয়ে দিয়ে চলে যায়, কেউ টের পায় না। যদি হঠাৎ কারো নজরে পড়ে, তাহলেই চাবি দিয়ে লেটার বক্স খুলে চিঠিটা নিয়ে আসে। প্রলয় একতলার লেটার বক্সে কী একটা লাগিয়ে ইলেকট্রিক তার জুড়ে চারতলার সুইচ বোর্ডের সঙ্গে কানেকশন করল। পিওন এসে বাক্সে চিঠি গলিয়ে দিলেই অমনি চারতলায় চিঁ-চিঁ করে একটা শব্দ শুরু হবে। সবাই বুঝতে পারবে লেটার বক্সে চিঠি এসেছে। তখন সুইচ টিপে দিলেই সেই চিঁ-চিঁ শব্দটা থেমে যাবে। তারপর যে কেউ নিচে গিয়ে লেটার বক্সের চাবি খুলে চিঠিটা নিয়ে আসতে পারে।

খাবার টেবিলে বসে প্রায় আলোচনা হত। তার বাবা বলতেন, 'এই যে ক্ষুদে বৈজ্ঞানিক, এখন নতুন কি থিয়োরী নিয়ে চিন্তা করছ?'

প্রলয়ের থালায় আরো দুটো বেগুনভাজা দিয়ে মা জবাব দিল, 'এখন ঠাট্টা করছ। কিন্তু দেখবে বড় হয়ে মস্ত কিছু আবিষ্কার করে দেশসুদ্ধ লোককে ওই একদিন তাক লাগিয়ে দেবে।'

প্রলয় কোনো উত্তর দিত না। শুধু ঠোঁট টিপে হাসত। বেগুন-ভাজা খেতে ভালোবাসে, তাই মা ওর জন্যে অন্তত: পাঁচ-ছটা ভাজা আলাদা করে রাখত।

রাত্তিরে শোবার আগে প্রলয় আলো জ্বালিয়ে নানা ধরনের বিজ্ঞানের বই পড়ত। একদিন হঠাৎ বইয়ের মলাট বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'সুশান্ত, ঘুমোলি নাকি?'

রাত দশটা বাজলেই সুশান্তর বেজায় ঘুম পায়। আর এখন তো পৌনে এগারোটা। নেহাৎ লোড-শেডিং, আলো-পাখা সব বন্ধ। তাই ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। প্রলয়ের ওসব বালাই নেই। তার একটা ইমার্জেন্সী লাইট আছে। লোড-শেডিং হলে ইমার্জেন্সী লাইটটা জ্বালিয়ে পড়াশুনো করে।

অন্ধকারে চোখ বুজে সুশান্ত সাত-পাঁচ নানা কথা চিন্তা করছিল। কখন কারেন্ট আসবে তা বোধহয় একমাত্র ঈশ্বর জানেন। অথচ পাখা না চললে ঘুম আসবে না। অগত্যা পাশ ফিরে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কী বলছিস?'

প্রলয় জবাব দিল, 'আমি ভাবছি একটা ছোট ট্রান্সমিটার বানাব।'

'ট্রান্সমিটার?'

'হ্যাঁ। এটা রেডিও-টেলিফোন বলতে পারিস। ট্রান্সমিটার, তার সঙ্গে একটা রিসিভিং সেট। মানে ঠিক টেলিফোনের মতো কথা বলা যাবে অথচ বেতার। কলকাতায় পুলিসের গাড়িতে আছে দেখলাম। ওরা কী করে জানিস?'

'কী?' সুশান্ত ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে তাকাল। আসলে পুলিসের গাড়ি সম্বন্ধে তার কোনো ঔৎসুক্য নেই। বরং একটা আতঙ্ক আছে। চারপাশে জাল বসানো কালো রঙের ভ্যানগুলো প্রায় নিঃশব্দে বাজারে কিংবা কোনো জনাকীর্ণ স্থানে এসে দাঁড়ায়। পিছনের দরজা খুলে ত্বরিতগতিতে একদল সাদা পোশাকের পুলিস নামে। তাড়া করে কিছু হকার ফেরিওয়ালাকে ধরে গাড়িতে টেনে তোলে। ফের স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে যায়।

প্রলয় সিলিঙে ঝোলানো ফ্যানটার নিশ্চল ব্লেডগুলোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত পরে সে নিজেই বলল, 'বিদেশে এর নাম ওয়াকি টকি। দেখবি একটা মাউথপীসের মতো জিনিসে মুখ রেখে একজন অফিসার অনর্গল কথা বলছে। সেই কথাগুলো আসলে মেসেজ, হেড কোয়ার্টার্সে রিসিভিং সেটে আর একজন শুনতে পাচ্ছে। তাতেই সব খবর পুলিসের সদর দপ্তরে দ্রুত পৌঁছে যায়। শহরে কোথায় কী ঘটছে, কী ব্যবস্থা নিতে হবে তা চটপট ঠিক করতে কোনো অসুবিধে হয় না।'

সুশান্ত ব্যাপারটা অত তলিয়ে চিন্তা করেনি। তবে কোথাও

গণ্ডগোল-ঝামেলা বাধলে সে লক্ষ্য করেছে, পুলিসের একজন অফিসার গাড়ির ভিতরে বসে একটা যন্ত্রে মুখ রেখে কি বলছে, কখনও কান পেতে শুনছে। আবার মুখ ফিরিয়ে অপেক্ষমান দু-একজন অফিসারকে হাত নেড়ে কিছু নির্দেশ দিচ্ছে।

প্রলয় বলল, 'ব্যাপারটা কিছুই নয়। রেডিও স্টেশনের মতো ইথারে শব্দতরঙ্গ পাঠানো। তবে সামান্য পার্থক্য আছে। রেডিও স্টেশন থেকে শব্দতরঙ্গ পাঠানো হয় অ্যামপ্লিচিউড্ মডিউলেশন বা এ. এম. পদ্ধতিতে আর সাধারণ ওয়্যারলেসে ওটা করা হয় ফ্রিকোয়েন্সি মডিউলেশন বা এফ. এম. পদ্ধতিতে। আসলে শব্দতরঙ্গের দুটো শ্রেণী। একটা ভূমি তরঙ্গ, অন্যটা আকাশীতরঙ্গ। ভূমি তরঙ্গ বেশী দূর যেতে পারে না। তবে সেটা নির্ভর করে তার কম্পাঙ্কের ওপর। যে ভূমিতরঙ্গের কম্পাঙ্ক এক লক্ষ কিলো সাইকেল, তার গতিবিধি খুব বেশী কয়েক মাইল। আবার যে ভূমি তরঙ্গের কম্পাঙ্ক এক শত কিলো সাইকেল সে অনায়াসে কয়েক শত মাইল দূরত্বে পৌঁছে যায়। আবার সহস্র সহস্র মাইল দূরে শব্দতরঙ্গকে পাঠাতে হলে চাই সর্ট ওয়েভ বা আকাশীতরঙ্গ। রেডিও স্টেশন থেকে ট্রান্সমিটারে পাঠানো এই সর্ট ওয়েভ অন্য এক মহাদেশে বসেও রিসিভিং সেটে দিব্যি ধরা যেতে পারে।'

রাত দুপুরে ওর এই লেকচার শুনতে অসহ্য লাগছিল। ভাবখানা যেন স্কুলের ফিজিক্সের স্যর। সুশান্ত তাই বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, 'তোর এই কম্পাঙ্কের কপচানি এখন থামাবি?'

প্রলয় মুচকি হেসে জবাব দিল,—'রাগ করছিস। কিন্তু জিনিসটা যখন তৈরি করব তখন তাজ্জব বনে যাবি। তবে একটা কথা ভাববার আছে।'

'কী সেটা?' সুশান্ত প্রশ্নটা তার দিকে ছুড়ে দিল।

প্রলয় গম্ভীরমুখে জানাল, 'এদেশে ওয়্যারলেস সেট বানানো বোধহয় আইনে আটকায়।'

সুশান্ত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'যাক! তাহলে বাঁচা গেছে। নইলে ওই নিয়ে মেতে রইলে ক্লাসের পড়াশুনো তোমার শিকেয় উঠত।'

প্রলয় দমবার ছেলে নয়। সে ধীরে ধীরে বলল, 'ট্রান্সমিটার তৈরি করা হয়তো চলে না। কিন্তু একটা রিসিভিং সেট বানালে বোধহয় দোষ নেই।' ঈষৎ চিন্তা করে ফের যোগ করল, 'রেঞ্জটা বেশ বড় হলে নানা জায়গার ওয়্যারলেস নিউজ দিব্যি শোনা যাবে।'

সুশান্ত জানে ছেলেটা একরকম পাগল। এই সব নিয়ে মেতে আছে। অন্য কোনো আকর্ষণ নেই। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে লেখা বই-টই পড়তে দারুণ ভালোবাসে। সুশান্ত তাই ওকে নিরুৎসাহ করল না। হেসে বলল, 'আচ্ছা সে যখন তৈরি হবে তখন দেখা যাবে। এখন শোন, কাল বিকেলে দুজনে একটা খেলা দেখতে যাব।'

'কী খেলা হচ্ছে এখন?' প্রলয় শুধোল।

সুশান্ত ব্যঙ্গ করে বলল, খড়্গপুরে থেকে তুই একেবারে গাঁইয়া হয়ে গেছিস। কলকাতা শহরে খেলা, মেলা আর হট্টগোলের কী কোনো সময়-অসময় আছে? বরং বলতে পারিস—

'খেলা, মেলা, হৈ-হট্টগোল
তাই নিয়ে কলকাতা সোরগোল।'

প্রলয় তবু শুধোল, 'কোথায় খেলা দেখতে যাব?

সুশান্ত বলল, 'গতকাল বাংলাদেশ থেকে সাব-জুনিয়র একটা ফুটবল টিম এসেছে। চল না, লেক-স্টেডিয়ামে ওদের খেলা দেখে আসি।'

খেলার মাঠে নিয়ে গেলে কী হবে? প্রলয়ের মন অন্য চিন্তায় মগ্ন হতে বিলম্ব করে না। একজন ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা ছোট বাইনোকুলার বের করে খেলা দেখছিলেন। সুশান্ত একবার সেদিকে তাকিয়ে ফিসফিস করল, 'বিলাতী জিনিস, বুঝলি?'

প্রলয় আড়চোখে যন্ত্রটির ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে জবাব দিল, 'হুঁ। ওটা অর্ডিনারি বাইনোকুলার নয়।'

'তাহলে?'

'মনে হচ্ছে প্রিজম বাইনোকুলার।' প্রলয় মন্তব্য করল।

ইতিমধ্যে বিপক্ষের গোলের মুখে জটলা, বলটা কেউ ঠেলে দিতে পারলেই জালে গিয়ে জড়াবে। দু-পক্ষের সমান চেষ্টা, বলটাকে নিজের আয়ত্বে রাখতে। বেশ উত্তেজনা সমস্ত মাঠে। কী হয়, কী হয়!

খালি চোখে নজর আসে না। সুশান্ত দাঁড়িয়ে উঠে গলাটা হাঁসের মতো বাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত গোল হয় কিনা তাই দেখতে চেষ্টা করল। কখন এক ফাঁকে বলটা গড়িয়ে বিপক্ষের ফুল ব্যাকের পায়ের কাছে পড়তেই সে ধাঁই করে একটা কিক্ মেরে সেটাকে মাঝ মাঠে পাঠিয়ে দিল।

খেলা ভাঙতেই সুশান্ত বলল, 'বাবাকে বলে একটা বাইনোকুলার কিনতে হবে, বুঝলি। নইলে দূর থেকে অনেক কিছু ভালো দেখা যায় না।'

প্রলয় বলল, 'কিনতে যাবি কেন? মিছিমিছি বেশী টাকা লাগবে। তার চেয়ে আমাকে ক'টা জিনিস এনে দে। তোকে পাওয়ারফুল বাইনোকুলার বানিয়ে দিচ্ছি।'

'তুই বাইনোকুলার তৈরি করবি?' সুশান্ত সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল।

'হ্যাঁ, এমন কী হাতি-ঘোড়া জিনিস ওটা? অর্ডিনারি বাইনোকুলার মানে যাকে অপেরা-গ্লাস বলি, সেটা আসলে এক জোড়া গ্যালিলিও টেলিস্কোপ', প্রলয় চটপট জবাব দিল। মৃদু হেসে ফের বলল, 'শুধু বাইনোকুলার কেন, তোকে একটা বিউটিফুল টেলিস্কোপ তৈরি করে দিতে পারি।'

'টেলিস্কোপ?'

'হ্যাঁ। ছাদে উঠে গ্রহ-নক্ষত্র দেখতে পাবি। একটু পরিষ্কার আকাশ হলে স্যাটার্নের রিং পর্যন্ত দেখা যায়। প্রলয় এক মুহূর্ত চিন্তা

করে বলল, 'খড়্গপুরে একবার চল। আমার টেলিস্কোপটা নিয়ে পরীক্ষা করবি। বাবা বলেন, তেমন উঁচু অবজারভেটরি থেকে এই টেলিস্কোপটা ঘুরিয়ে আকাশের অনেক কিছু দেখা সম্ভব।'

এই ধরনের সব বৈজ্ঞানিক কথাবার্তায় সুশান্ত তেমন উৎসাহ বোধ করে না। টেলিস্কোপ, বাইনোকুলার, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি,—এ সব তো বাজারে পয়সা দিলেই মিলবে। তা নয়, এর কলা-কৌশল শেখার জন্য আবার মাথা ঘামানো? রাত্তিরে প্রলয়কে সে দেখেছে, বইয়ের পাতায় জটিল ধাঁধার মতো একটা আঁকিবুকির ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে মনোযোগ দিয়ে কী যেন বুঝতে চেষ্টা করছে।

জিজ্ঞাসা করতে প্রলয় জবাব দিল, 'সার্কিটটা শেখার চেষ্টা করছি।'

'সার্কিট?' সুশান্ত ভ্রূ কোঁচকাল।

'হ্যাঁ।' প্রলয় মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল। বলল, 'সার্কিট হল ইলেকট্রনিক কলা-কৌশলের ভাষা। আর ভাষা না জানলে কেমন করে বুঝবি বল? তাহলে কোনোদিন এরকম একটা বানাতেও পারবি না।'

সুশান্ত ঠোঁট উলটিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে পাশ ফিরে শুল। বয়ে গেছে ওসব বানাতে। তার মন পড়ে থাকে খেলার মাঠে। এ বছর লীগ চ্যাম্পিয়ন কে হতে পারে তাই নিয়ে সে রীতিমত একটা গবেষণা করছে। সুশান্তর ফেভারিট টিম অবশ্য মোহনবাগান। কিন্তু এই সীজনে সেই দলের খেলা যেন নৈরাশ্যজনক। আসলে ময়দানের এই খেলাধুলোর নেপথ্যে বোধহয় আর একটা খেলা চলে। ইদানীং সুশান্তর কানে সে খবর অল্প-বিস্তর আসে।

গ্রীষ্মের ছুটির পর প্রলয় তাকে একটা চিঠি লিখেছিল। ওর সব চিঠি একই ধরনের। গতবার কলকাতা থেকে যাওয়ার সময় সে বলে গেল একটা রেডিও-ঘড়ি বানাবার কথা চিন্তা করছে। কিছু সরঞ্জাম চাই,—তার জন্য ক'দিন চাঁদনীতে ঘোরাফেরা করল। কিন্তু সমস্ত জিনিস পায়নি। ওরা প্রলয়কে বোম্বাই আর দিল্লীর দুটো ঠিকানা

দিয়েছিল। বাকি জিনিসের জন্যে সেখানে একবার চিঠি লিখে দেখতে পারে। যদি পাওয়া যায় তাহলে নিশ্চয় পার্শেলে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু বোম্বাইয়ের সেই দোকানে পার্টসগুলো পাওয়া যায়নি। অগত্যা সুশান্তকে ফের চিঠি লিখেছে। যদি সময় করে চাঁদনীতে গিয়ে একবার খোঁজ নেয়, তাহলে ভালো হয়। জিনিসগুলো পেলেই ঘড়িটা চটপট বানিয়ে ফেলবে।

কিন্তু চাঁদনীর দোকানিরও সেই এক কথা। ওসব পার্টস এখানে পাওয়া যাবে না। সুশান্ত চিঠিতে সে কথা জানিয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকেই প্রলয়ের আর খবর নেই। বোধহয় পার্টসগুলো পাওয়া গেল না বলে একটু মুষড়ে পড়েছে। কিন্তু তার জন্যে সুশান্ত কী করতে পারে? ওই ক'টা জিনিসের খোঁজে চাঁদনীতে সে কম হাঁটাহাঁটি করেনি।

অ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ হবার দিন কয়েক পরে হঠাৎ প্রলয়ের এক চিঠি এসে হাজির। খামটা ছেঁড়ার আগে সুশান্তর মনে হল প্রলয় নিশ্চয় সেই রেডিও-ঘড়িটার ব্যাপারে কিছু লিখেছে, কিংবা ওর ট্রান্সমিটার বা রিসিভিং সেটের যন্ত্রপাতি। বোধহয় পার্টসগুলো এখনও জোগাড় করতে পারেনি। তারই জন্যে ফের সুশান্তর শরণাপন্ন হয়েছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা হতাশ ভঙ্গি করে সে এক মুহূর্ত চিন্তা করল। এখন ওই জিনিসগুলোর খোঁজে তাকে ফের চাঁদনীতে কিংবা মেট্রো সিনেমার পাশের গলিতে চক্কর দিতে হবে। আর এই সব ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির দামের কোনো ঠিক আছে? যে যা পারে দাম হাঁকে। আর একবার যদি আঁচ করে খদ্দের এই জিনিসটা খুঁজছে তাহলে আর কথা নেই। একটা বেমক্কা দাম শুনিয়ে মিটিমিটি হাসবে।

খামটা ছিঁড়ে কয়েক ছত্র পড়তেই সুশান্ত রীতিমত কৌতূহলী হয়ে উঠল। আশ্চর্য! রেডিও-ঘড়ি কিংবা ট্রান্সমিটার প্রসঙ্গ এতে আদৌ নেই। বরং প্রলয় যা লিখেছে তা জানবার পর সুশান্ত

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। ব্যাপারটা কী? প্রলয় কি সত্যি সেখানে যাচ্ছে? সুশান্তকেও সে নাকি সঙ্গে নিতে চায়? কিন্তু অত দূরে যেতে মা-বাবা কি তাকে পারমিশন দেবে? বরং জানতে পারলে হয়তো খড়্গপুরে যাওয়ার প্রোগ্রামটা ভেস্তে যাবে। তার চেয়ে এই চিঠির কথা এখন চেপে যাওয়া ভালো। আর প্রলয় তাকে কি লিখেছে তাই নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। সুতরাং চিঠির বিষয়ে কেউ খোঁজও করবে না।

সুশান্ত ধীরে ধীরে চিঠিটা আবার পড়ল।

খড়্গপুর,

প্রিয় সুশান্ত, রবিবার

গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রায় মাসখানেক কলকাতায় কাটিয়ে এসে তোকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। তার উত্তরও পেয়েছি।

ভেবেছিলাম এরপর তোকে একটা বড় করে চিঠি লিখব। কিন্তু স্কুল খুলতেই পরীক্ষা, একসঙ্গে অনেক পড়ার চাপ,—তাই ইচ্ছে থাকলেও আর লেখা হয়ে ওঠেনি। কিছুটা অবশ্য গড়িমসি, নইলে একটা চিঠি লিখতে কি এমন সময় লাগে? তবে পুজোর বন্ধটা তো পড়া নিয়েই কাটল। ভেকেশান শেষ হলেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা,—তাই বাবার কড়া হুকুম ছিল, একটি মিনিটও যেন না অপচয় করি। যাই হোক গতকাল পরীক্ষার পাট চুকেছে,—এখন আমি ফ্রি। যা খুশি করতে পারি, যতক্ষণ ইচ্ছে চিঠি লিখব, তাই নিয়ে কেউ কথা বলবে না।

হ্যাঁ, তোকে একটা খবর জানাব বলে কলম নিয়ে বসেছি। যা শুনলে তুই বোধহয় চমকে যাবি। আমাদের ক্লাসে নাগরাজন বলে একটা ছেলে পড়ে। ওর বাবা লোকো শেডের ফোরম্যান। বাড়ি কেরালায়,— কালিকটে। এই বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে নাগরাজন দেশে বেড়াতে গিয়েছিল। তবে ইতিহাসে আমরা যাকে কালিকট নামে জানি, ওখানকার লোকে তাকে কোঝিকোডে বলে। নাগরাজনের

বাড়িটা ঠিক কালিকটে নয়। শহর থেকে মাইল পনের দূরে কাটাঙ্গাল বলে একটা ছোট জায়গা আছে সেখানে। কালিকট আর ওয়াইনাদ দুটো পাশাপাশি জেলা। কেরালা সমুদ্রতীরবর্তী হলেও এই দুটো জেলায় পশ্চিমঘাট পর্বতমালার নানা শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে। কালিকট থেকে আরো উত্তরে গেলে সমুদ্র থেকে খানিকটা দূরে মাঝারি উচ্চতার কয়েকটা পাহাড় রয়েছে। মালয়ালী ভাষায় পাহাড়গুলোর কি নাম,—এখনই তোকে জানাতে পারলাম না। তবে নাগরাজনদের গ্রাম থেকে একটা পাহাড় বেশী দূরে নয়। ভূগোলে নিশ্চয় পড়েছিস, দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমী বায়ু পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় প্রতিহত হয় বলে কেরালায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ফলে গাছপালা টিয়াপাখির লেজের মতো সবুজ. ঝোপঝাড় সর্বত্র। নাগরাজন বলছিল ওদের গ্রাম থেকে খানিকটা গেলেই জঙ্গল শুরু হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে ঘন বন,… মাঝে মাঝে জন্তু-জানোয়ারের উপদ্রব হয়। এবার গ্রীষ্মের বন্ধে বাড়ি গিয়ে নাগরাজন একটা অদ্ভুত খবর শুনল। গ্রামের কাছেই যে পাহাড়টা, রাত্তিরে তার মাথায় একটা লাল আলো জ্বলে। সন্ধের পর থেকে ঘণ্টা দুই সেটা দেখা যায়,—তারপর একসময় আপনি নিভে কিংবা কেউ নিভিয়ে দেয়। রাত্তিরে আর জ্বলে না। তবে মাসে দু একবার ওই লাল আলোটা সবুজ হয়ে যায়। তার কোনো দিন ক্ষণ নেই, হঠাৎ যে কোনো রাত্তিরে আলোটা গ্রীণ সিগন্যালের মতো জ্বলে। একদিন কিংবা দুদিন থাকে,—তারপর আবার যথাপূর্বম্ লাল আলো দেখা দেয়। গ্রামের লোক অবশ্য এই নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তবে কাঠ কাটতে কিংবা অন্য কাজে যারা ওই পাহাড়ে উঠেছে তারা একজন আধবুড়ো পাগলাটে ধরনের লোককে পাহাড়ের ওপরে দেখতে পায়। এক মুখ দাড়ি, উস্কোখুস্কো চুল,—খুব মোটা কাচের চশমা চোখে। পাহাড়ের ওপরে একটা কাঠের ঘর বানিয়ে লোকটা থাকে। শুধু মাঝে মাঝে দু-একদিন বেপাত্তা,—কোথায় যায় কেউ জানে না। আবার থলিতে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে ঠুক ঠুক করে একদিন ফিরে আসে।

কাঠের ঘরে লোকটা কিন্তু চুপচাপ বসে থাকে না। বেশ কিছু বইপত্তর আছে আর নানা ধরনের যন্ত্রপাতি,—লোকটা তাই নিয়ে মশগুল থাকে। আজ পর্যন্ত কারো সঙ্গে একটি কথা বলে নি। আশেপাশের লোক যারা কাঠ কাটতে ওপরে উঠেছে তারা হঠাৎ ওর

সে দাঁত খিঁচিয়ে একটা লাঠি নিয়ে তাড়া করে।

সামনে গিয়ে পড়লে সে দাঁত খিঁচিয়ে একটা লাঠি নিয়ে তাড়া করে। সেই ভয়ে কেউ ওর ডেরার ত্রিসীমানা মাড়ায় না।

নাগরাজন বলছিল, এই অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটার কথা কিছুদিনের মধ্যে আশেপাশের বাসিন্দারা জানতে পারল। পাহাড়ের চূড়ায় একটা কাঠের ঘর বানিয়ে কেন সে অমনভাবে রয়েছে? কী উদ্দেশ্য তার? লোকটা কী বিকৃতমস্তিষ্ক? কিংবা খুনে-বদমাশ, অপরাধের সাজা

এড়াতে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন করে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত খবর পেয়ে গ্রামের চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে দুজন সিপাই এসেছিল লোকটার সম্বন্ধে খোঁজ নিতে। কিন্তু আপত্তিকর কিছু তারা তল্লাসি করে পায়নি। বনজঙ্গলে লোকটা একা কাটায়, তবু তার কাছে পিস্তল-বন্দুক দূরে থাক একটা ছোরাছুরি পর্যন্ত নেই। শুধু শক্ত দু-তিনটে লাঠি। এ ছাড়া ওর নিজস্ব সম্পত্তি বলতে কিছু বই, যন্ত্রপাতি আর ইলেকট্রিক তার। কিন্তু যা লিখেছিলাম, সন্ধ্যে হলেই পাহাড়ের মাথায় একটা লাল আলো জ্বলে, তারপর সেটা নিভে যায়। কোনোদিন আলোটা হঠাৎ সবুজ হয়ে ওঠে। দু-একদিন এরকম থাকে। তারপর যা ছিল তাই,—সন্ধ্যেবেলা রক্তচক্ষুর মতো লাল আলোটা জ্বলজ্বল করে।

এই সামান্য ঘটনা নিয়ে কাটাঙ্গাল কিংবা আশেপাশের মানুষের মনে দুশ্চিন্তা নেই। পাহাড়ের মাথায় দু-এক ঘণ্টা একটা লাল আলো দেখা দিলে কার কী যায় আসে? যদি সেটা কোনোদিন সবুজ হয়ে ওঠে তাতে ক্ষতি কিসের? কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা আমার মনে রীতিমত কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। কে ওই লোকটা? সত্যি কী ওর মাথা খারাপ? আর সন্ধ্যেবেলা ওই লাল আলো কিসের সঙ্কেত? কেন সেটা হঠাৎ সবুজ হয়ে ওঠে? আমার কী মনে হয় জানিস? ওই পাগলাটে ধরনের লোকটার ভিতরে একটা গভীর রহস্য রয়েছে। পাহাড়ের মাথার লাল-সবুজ আলো সেই রহস্যকে আরো গাঢ় করেছে।

চিঠির শেষ কথাটা এবার লিখি। ডিসেম্বরের প্রথমেই অর্থাৎ আগামী সপ্তাহে নাগরাজন ফের বাড়ি যাচ্ছে। দিন পনের বাদে ফিরবে। স্কুলের রেজাল্ট বেরোতে এখনও বেশ দেরি। মনে হয় বড়দিনের ছুটির দু-একদিন আগে রিপোর্ট দেবে। তাই এই সুযোগে ওর সঙ্গে আমি কোঝিকোডে যাচ্ছি। সেখান থেকে কাটাঙ্গালে। নাগরাজন আগেও কয়েকবার যেতে বলেছিল। কিন্তু তখন কোনো

আকর্ষণ ছিল না। তাই এড়িয়ে গিয়েছি। এখন পরিস্থিতি আলাদা। পাহাড়ের ওই আধ-পাগলা লোকটা, তার যন্ত্রপাতি আর লাল-সবুজ সঙ্কেত আমাকে যেন হাতছানি দিচ্ছে। ব্যাপারটা কী জানতেই হবে। কে ওই লোকটা? কোনো আপনভোলা বৈজ্ঞানিক নাকি? নির্জন পাহাড়ে নানা বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। কিংবা ওর অন্য কোনো অভিসন্ধি আছে। কেরালা যাওয়ার কথা শুনে বাড়িতে অবশ্য প্রথমে আপত্তি করেছিল। কিন্তু নাগরাজনের বাবা নিজে এসে বারবার বললেন। তা ছাড়া ওর আম্মা সঙ্গে যাবে শুনে মা পর্যন্ত অমত করতে পারেনি। হ্যাঁ, এখন আসল কথাটা বলি। আমাদের সঙ্গে কাটাঙ্গালে যাবি? তুই সঙ্গী হলে কিন্তু খুব ভালো হয়। আমরা থ্রি মাস্কেটিয়ার্স রহস্যের গোপনসূত্রটা নিশ্চয় টেনে বের করতে পারব।

যদি রাজি, তাহলে চটপট চলে আয়। আর তুই তো ভীতু ডরপোক ন'স। এমন একটা অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ কী আর পাবি? তবে মাসিকে এখনই কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তাহলে নিশ্চয় বাগড়া দেবে। একবার খড়্গপুরে এলেই হয়, তারপর এখান থেকেই আমাদের অভিযান শুরু। অপারেশান কাটাঙ্গাল—।

ভালবাসা এবং শুভেচ্ছা—

ইতি

প্রলয়

দুই

খড়্গপুর স্টেশনে প্রলয় তার জন্য প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে।

সুশান্ত একা এসেছে। মা অবশ্য পই পই করে বাবাকে বলেছিল সঙ্গে একজন লোক দিতে। খড়্গপুরে তাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরতি ট্রেনে চলে আসবে। কিন্তু সুশান্ত কিছুতেই রাজি হয়নি। আশ্চর্য! সে একটা দুগ্ধপোষ্য বালক নাকি? একটি বছর পেরোলে মাধ্যমিক পাস করে হয়তো কলেজে ঢুকবে। তার বয়সী অন্য ছেলেরা হিল্লি-দিল্লি করছে। আর এই সামান্য আড়াই ঘণ্টার রাস্তা। মেল ট্রেন হলে অনেক কম সময়ে খড়্গপুরে পৌঁছে যায়। শেষপর্যন্ত বাবা তার সপক্ষে সায় দিলেন। বললেন, 'ঠিক আছে। আমি টেলিফোনে জানিয়ে দিচ্ছি তুই কবে কোন ট্রেনে রওনা হবি। ওরা কেউ প্ল্যাটফর্ম থেকে তোকে নিয়ে যাবে।' এরপর মা আর অমত করেনি। হাওড়া স্টেশনে এসে বাবা তাকে গাড়িতে তুলে দিলেন। আর ট্রেন খড়্গপুরে ঢুকতেই সুশান্ত সাইকেলটা হাতে নিয়ে চটপট প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল।

প্রলয় একগাল হেসে বলল, 'চলে আসতে পারলি?'

'পারলাম মানে? বাবা তো আমাকে এখানেই পাঠাচ্ছিল।' সুশান্ত ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। ফের বলল, 'যখন কথা-বার্তা সব ঠিক তখন তোর চিঠিটা হাতে পেলাম।'

'তাহলে কেরালা যাওয়ার কথা বাড়িতে বলিসনি?'

'পাগল।' সুশান্ত চতুর নায়কের মতো মুচকি হাসল। শেষে বলল, 'কেরালায় যাব শুনলে মা নির্ঘাত বেঁকে বসত। হায়দ্রাবাদে ছোটপিসির কাছে পাঠাতে রাজি হয়নি।'

ঈষৎ মাথা চুলকে প্রলয় জানাল, 'তোকে সঙ্গে নেবার কথা

এখানেও ফাঁস করিনি। ভাবলাম আগে তো আয়, তারপর না হয় দেখা যাবে।'

সুশান্ত প্রায় ঘোষণা করল, 'একবার যখন এসে পড়েছি তখন তোর সঙ্গে না গিয়ে ছাড়ছিনে। আর তোকে যখন ছাড়তে রাজি হয়েছে তখন আমার বেলাতেও মাসি বোধহয় আপত্তি করবে না।'

'মায়ের হয়তো অমত নেই', প্রলয় স্বীকার করল। সামান্য চিন্তা করে ফের বলল, 'কিন্তু কলকাতায় বাড়ির কাউকে না জানিয়ে মা কি তোকে কেরালায় যেতে দেবে?'

ব্যাপারটা যে সরলরেখার মতো সহজ নয়, সেটা সুশান্তও বোঝে। তবু আলোচনা লঘু করবার জন্যে সে প্রলয়ের পিঠ চাপড়ে বলল, 'ঠিক আছে। ওসব কথা পরে ভাবলেই হবে। এখন বাড়ি চল।'

স্টেশন থেকে খানিকটা দূরে রেলওয়ে কোয়াটার্সে প্রলয়রা থাকে। বাবা গার্ড। খড়্গপুর থেকে পুরী, কখনও ওয়ালটেয়ার পর্যন্ত যায়। ছেলেবেলায় প্রলয় ভাবত, বড় হয়ে সে বাবার মতো গার্ড হবে। একটা লাঠির ডগায় সবুজ রঙের কাপড় বেঁধে সেটা প্রবল বেগে দুলিয়ে গাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দিত। তারপর ছোট একটা বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে নিজেই এঞ্জিনের ঢঙে হুস হুস শব্দ করে ছুটে বেড়াত। বড় হবার পর প্রলয়ের সে চিন্তা গেছে। এখন তার বৈজ্ঞানিক হবার বাসনা। স্কুলে তেমন লাইব্রেরী নেই, তাই মাধ্যমিক পাস করে সে বরং কলেজে ঢুকবে। তারপর উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি অতিক্রম করলেই ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে কোনো নামী কলেজে ভর্তি। শেষে এম. এস-সি. ডিগ্রী পেলে বাকি জীবনটা রিসার্চের ল্যাবরেটরীতে কাটিয়ে দেবে। একটা কিছু আবিষ্কার করতে পারলেই তার পৃথিবীতে আসা সার্থক হবে বলে সে মনে করে।

কোয়ার্টারের সামনে রিক্শা থামতেই কলরব করে অনেকে বেরিয়ে এল। প্রথমে প্রলয়ের ভাই নিলয়, তারপর ওর বোন তৃপ্তি, শেষে আরো কারা যেন গেটের সামনে এসে ভিড় করল।

সুটকেসটা হাতে নিয়ে সুশান্ত নামল। অমনি গেট খুলে নিলয় প্রায় দৌড়ে এসে কাছে দাঁড়াল। লাগেজটা একরকম কেড়ে নিয়ে বলল, 'দাও তো, আগে এটা রেখে আসি।' বলেই আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে সুটকেসটা হাতে নিয়ে সে প্রায় দৌড়ে বাড়িতে ঢুকল।

পাকা মেয়ের মতো চোখ ঘুরিয়ে সুপ্তি বলল, 'আমরা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। শেষে ভাবলাম গাড়ি বুঝি আজ অনেক লেট।'

সুশান্ত ওর মাথায় হাত রেখে সামান্য আদর করল। বলল, 'লেট একটু ছিল। মিনিট পনের হবে। মেচেদাতে অনেকক্ষণ গাড়ি দাঁড়িয়ে। সামনে নাকি লোক্যাল যাচ্ছে। শেষে বালিচক স্টেশনে এক্সপ্রেস গাড়িটা লোক্যালকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এল।'

বাড়িতে ঢুকে প্রলয় একেবারে হৈ-চৈ শুরু করে দিল। মাসি কাছে এসে সুশান্তর বাড়ির খবর নিচ্ছিল। প্রলয় তাকে ঝটপট খাবার দিতে বলল। মাসি খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওমা! তুই তো অবেলায় খেয়ে উঠলি। এরই মধ্যে আবার খিদে পেয়ে গেল?'

'সে কখন হজম হয়ে গেছে।' প্রলয় কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা ঢঙ করে হাসল।

বেলা প্রায় শেষ। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কোয়ার্টারের সামনে খেলার মাঠে একদল ছেলেমেয়ে মহানন্দে ছুটোছুটি শুরু করেছে। মগডালে রোদ্দুর। নিশিযাপনের উদ্দেশ্যে পাখিরা এরই মধ্যে গাছের ডালে আশ্রয় নিচ্ছে।

মিনিট পনের না যেতেই তার মাসি থালায় লুচি আর বেগুনভাজা সাজিয়ে নিয়ে এল, প্রলয়ের জন্য আলাদা প্লেটে খাবার। বেগুনভাজা কম দেখে সে চেঁচিয়ে বলল, 'ওমা! আমার মোটে তিনটে নাকি? সুশান্তকে পাঁচটা দিয়েছ।'

মাসি তাড়াতাড়ি আর একটা বেগুনভাজা এনে ছেলের প্লেটে দিয়ে

বলল, 'এমন ছেলেমানুষের মতো চেঁচামেচি করিস। দিন দিন তোর বয়স কম হচ্ছে নাকি?'

সন্ধ্যে হতেই বেজায় ঠাণ্ডা। খড়্গপুরে এমন কনকনে শীত কে জানত? এখনও পৌষের অনেক দেরি। অথচ বাইরে এমন হিম। সুশান্ত সঙ্গে চাদর আনেনি। তার মাসি নিজের একখানা শাল বের করে দিতেই সেটা জড়িয়ে হাত-পা ঢেকে সে কিঞ্চিৎ উষ্ণ বোধ করল।

প্রলয় ফিসফিস করে বলল, 'কালিকটে কিন্তু একদম ঠাণ্ডা নেই। সী-সাইড কিনা—'

সুশান্ত ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'যাওয়ার ডেট কি ঠিক হয়ে গেছে?'

'মোটামুটি ঠিক বলতে পারিস। মানে রিজার্‌ভেশন্ পেলেই হয়। সামনের সপ্তাহে যেদিন পাওয়া যাবে সেদিনই রওনা হচ্ছি।'

'আমার জন্যেও তো রিজার্‌ভেশন্ চাই।' সুশান্ত বলল, 'নইলে যাব কেমন করে?'

প্রলয় মুখ নিচু করে জবাব দিল, 'তোর যাওয়ার কথা তো এখনও ফাঁস করিনি। মা-বাবা কেউ জানে না।'

'আচ্ছা, মেসোমশায়কে তো দেখতে পেলাম না। গেছেন কোথায়?' সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল।

'ওয়ালটেয়ার।' প্রলয় উত্তর দিল। ফের বলল, 'কাল ভোরে ম্যাড্রাস মেলে আসবার কথা। এলেই দেখতে পাবি।'

সুশান্ত একটু চিন্তা করে বলল, 'তোর সেই নাগরাজন থাকে কোথায়? কাল সকালে তাকে নিয়ে আয় না। ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করি।'

'নাগরাজনদের কোয়ার্টারটা আর একটু ভেতরে। সাইকেলে গেলে মিনিট পাঁচ লাগবে।' প্রলয় জবাব দিল। তারপর নিজেই প্রস্তাব করল, 'চল না, কাল সকালে ওখানে যাই। আম্মার সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে বলব, সুশান্ত আমাদের সঙ্গে যাবে।'

'কিন্তু ধর, নাগরাজনের মা যদি আপত্তি করে ?'

'দূর বোকা!' প্রলয় তার আশঙ্কা হেসে উড়িয়ে দিল। বলল, 'আম্মাকে তুই দেখিসনি। এমন মিষ্টি কথা। গেলেই দেখবি কি রকম যত্ন করে। আর তুই কাটাঙ্গালে যেতে চাস শুনলে হয়তো আদর করে বুকে টেনে নেবে।'

সুশান্তকে তবু উদ্বিগ্ন দেখাল। সে মাথার চুলে একবার হাত বুলিয়ে বলল, 'কিন্তু মাসি না পাঠাতে চাইলে তো আমার কেরালা যাওয়া হবে না।'

'তা ঠিক।' প্রলয় ভ্রূ কুঞ্চিত করল। এক মুহূর্ত পরে নিজেই বলল, 'বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মাকে হয়তো রাজি করতে পারব। কিন্তু তোরও সাহায্য চাই।'

'কি রকম ?' সুশান্ত সাগ্রহে তাকাল।

'তুই বলবি প্রলয়ের সঙ্গে কোথাও গেলে বাড়িতে মা-বাবা কেউ আপত্তি করবে না। তাহলে হয়তো অমত না করতে পারে।' কথা শেষ হতেই সুশান্তকে জড়িয়ে ধরে সে খি-খি করে হেসে উঠল।

রাত্তিরে খাওয়ার পর আপাদমস্তক ঢেকে দুজনে শুয়ে পড়ল। পাশাপাশি দুটি ফোল্ডিং খাটে বিছানা। বাড়িটা নেহাৎ ছোট নয়। তিনটে কামরা। নিলয় আর সুপ্তিকে নিয়ে মাসি বড় ঘরটায় থাকে। মাঝের ঘরটা ছোট, ওটা প্রলয়ের বাবার। তবে ডিউটিতে গেলে ফাঁকা, কেউ শোয় না। সামনের রুমটা প্রলয়ের দখলে। ওটা তার পড়ার ঘর, শয়ন-কক্ষও বলা চলে। বইপত্তর, প্রলয়ের যন্ত্রপাতি সব ওখানেই থাকে। ইচ্ছে হলে রাত জেগে পড়াশুনো করে। কিংবা তার নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবনী কৌশল নিয়ে মাথা ঘামায়,······ছবিতে সার্কিটের ওপর ঝুঁকে কি যেন ভাবে।

মুখের থেকে লেপটা সরিয়ে সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'তোর সেই ট্রান্সমিটার তৈরির কাজ কদ্দূর এগোল ?'

প্রলয় একটা মোটা কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে। সে চোখ না খুলে

জবাব দিল,—'ট্রান্সমিটার বানাতে গেলে অনেক খরচ। তাই শুধু একটা রিসিভিং সেট তৈরি করেছি।'

'রিসিভিং সেট মানে রেডিও?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারিস। তবে সামান্য একটু পার্থক্য আছে। রেডিও-স্টেশন থেকে অ্যামপ্লিচিউড্ মডিউলেশন করা বেতার-তরঙ্গ পাঠানো হয়। তা বহু দূর পর্যন্ত যায়। রেডিওর গ্রাহক যন্ত্রে এগুলো ধরা পড়ে। আর আমি যে সেটটা বানিয়েছি তাতে ফ্রিকোয়েন্সি মডিউলেটেড তরঙ্গও শব্দে রূপান্তরিত হবে।* আমার রিসিভিং সেটের এটাই বিশেষত্ব।'

সুশান্ত অত তলিয়ে চিন্তা করে না। এই সব ছাইপাঁশ কি তার মাথায় ঢুকবে? রেডিওর নব্ ঘোরালেই যন্ত্রটার ভিতর থেকে গানের সুর কিংবা ফুটবল অথবা ক্রিকেটের ধারাভাষ্য শোনা যায়। সে এই পর্যন্ত বোঝে। আর প্রলয়টা ওসব খেলাধুলোর জগত থেকে দূরে যেন এক দ্বীপের বাসিন্দা। দিবারাত্রি খালি কি বানাবে সেই চিন্তায় মশগুল হয়ে আছে।

জানালার পাল্লা দুটো বন্ধ। তবু ফাঁক দিয়ে শীতের কনকনে হাওয়া ঘরে ঢুকছে। লেপটা ফের মুখের ওপর টেনে দিয়ে সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'তোর সেই রেডিও-ঘড়ি তো আর তৈরি হয়নি?'

'কেমন করে হবে?' প্রলয় যেন দুঃখের সঙ্গে জানাল। বলল, 'চাঁদনীতে পার্টস পাওয়া গেল না। তাই দিল্লী আর বোম্বাইতে চিঠি লিখলাম। সেখান থেকেও একই জবাব,—সরি, নট অ্যাভেলেবেল।'

হঠাৎ পুরানো কথা মনে হতে সুশান্ত প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, তোর টেলিস্কোপটা কোথায়? যেটা দিয়ে স্যাটার্নের রিং পর্যন্ত দেখা যায়।'

'আছে ওই আলমারির ভিতরে।' প্রলয় মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল। ঈষৎ হেসে ফের বলল, 'কিন্তু এই ঠাণ্ডায় মাঠে বসে টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র দেখতে পারবি?'

'ওরে বাবা!' সুশান্ত যেন আঁতকে উঠল। বলল, 'তার আগেই জমে বরফ হয়ে যাব।'

'ভয় নেই।' প্রলয় তাকে আশ্বাস দিল। বলল, 'এখন ভাবছি টেলিস্কোপটা সঙ্গে নিয়ে যাই। যদি হঠাৎ প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া কেরালায় এত ঠাণ্ডা নেই। নাগরাজনদের বাড়ির কাছে ফাঁকা জায়গায় টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে তোকে গ্রহ-নক্ষত্র সব চিনিয়ে দেব।'

বেলা আটটায় প্রলয়ের ঘুম ভাঙল। লেপের উষ্ণ আমেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে তার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কতক্ষণ আর এমনি শুয়ে থাকা যায়? মাসির বাড়ি, তা ছাড়া প্রলয় কখন ঘুম থেকে উঠেছে তাও সে জানে না। জানালার পাল্লা দুটো খুলতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া যেন তাকে অগ্রাহ্য করে ঘরের চারপাশে ছড়িয়ে গেল। বাইরে রোদ উঠেছে। মাঠের ঘাস ভিজে, পাশে একটা পাতাবাহার ঝোপের গায়ে টলটলে শিশির।

ঘরে ঢুকে সুপ্তি বলল, 'বাব্বা! কি ঘুম তোমার সুশান্তদা। বেলা আটটা পর্যন্ত শুয়ে রইলে।'

এতক্ষণ জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সুশান্ত বাইরের পৃথিবীটা দেখছিল। সুপ্তির কথা শুনে সে ফিরে তাকাল। জিজ্ঞাসা করল, 'এই, প্রলয় কোথায়?'

'বাজারে মাংস কিনতে গেছে।' সুপ্তি ছোট্ট জবাব দিল। ফের বলল, 'দাদা তো সেই ভোরবেলা ঘুম ভেঙে ওঠে।'

সুশান্তর এবার সঙ্কোচ হচ্ছিল। এর মানে বাড়িতে চায়ের পাট কখন চুকে গেছে। এখন সে মুখ-হাত ধুয়ে তৈরি হলে মাসি আবার তার জন্য কেৎলিতে করে চায়ের জল চাপাবে।'

ঈষৎ কুণ্ঠার সঙ্গে সে বলল, 'আমার উঠতে বড্ড দেরি হয়ে গেল, তাই না? তোমাদের নিশ্চয় চা-টা খাওয়া শেষ?'

'কখন!' সুপ্তি হাত নেড়ে একটা ভঙ্গি করে জবাব দিল। ফের বলল, 'তুমি মুখ হাত ধুয়ে এলেই মা আবার চা তৈরি করে দেবে।'

সুশান্ত প্রায় অপরাধীর মতো বোধ করছিল। ছি-ছি! এত বেলা অব্দি ঘুমোন তার কখনও উচিত হয় নি। একটা কৈফিয়ত গোছের খাড়া করে সে বলতে চেষ্টা করল, 'প্রলয় যদি আমাকে ঘুম থেকে তুলে দিত তাহলে কি এত বেলা অব্দি শুয়ে থাকতাম?'

শুনে সুপ্তি হি-হি করে হাসল। বলল, 'যা কুম্ভকর্ণের মতো ঘুম তোমার! নইলে দাদা তো দু-তিনবার ডেকেছিল। শেষে মা বলল, আহা! দু দিন বেড়াতে এসেছে বৈ তো নয়। না হয় একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমোল।'

মুখ হাত ধুয়ে বেরিয়ে আসতেই মেসোমশায়ের সঙ্গে দেখা। বেশ দশাসই চেহারা। সব চেয়ে আকর্ষণীয় তার গোঁফজোড়া,—সাদা-পাকা,

শুনলাম তুমি নাকি কাল বিকেলে এসেছ

ঠিক উড়ন্ত পাখির ডানার মতো। তবে ভারি অমায়িক, সর্বদা মুখে হাসি। ভদ্রলোক ওয়ালটেয়ার না কোথায় যেন গিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ একটু আগে সেখান থেকে ফিরেছেন। এখনও গায়ে রেলের কোট, গলায় কম্ফর্টার। পরনে সাদা প্যান্ট। তাকে দেখেই সহাস্যে বলে উঠলেন, 'আরে সুশান্ত যে, শুনলাম তুমি নাকি কাল বিকেলে এসেছ।'

সুশান্ত হেঁট হয়ে প্রণাম করতেই মেসো বললেন, 'তারপর বাড়ির সব খবর কি? মা-বাবা সবাই বেশ ভালো আছেন?'

মাথা হেলিয়ে সুশান্ত সায় দিল।

মেসো আগের মতো হেসে বললেন, 'এ দিকের খবর শুনেছ নিশ্চয়? তোমার বন্ধুটি তো সামনের উইকে কেরালা রওনা দিচ্ছে।'

সুশান্ত সব জানে। কিন্তু এই মুহূর্তে কি বলা উচিত হবে তাই ভেবে পাচ্ছিল না। প্রলয়ের সঙ্গে কেরালা যাবে বলেই তো সে খড়্গাপুরে এসেছে। কিন্তু কথাটা চটপট ফাঁস করা কি ঠিক হবে? অন্ততঃ প্রলয়ের সঙ্গে একটা যুক্তি না করে কিছু বলা নিশ্চয় উচিত হবে না।

ঠিক তখুনি এক হাতে চায়ের কাপ, অন্য হাতে ডিশের ওপর গরম পরটা আর আলুভাজা সাজিয়ে মাসি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দার ছোট টেবিলে খাবারের ডিশ আর পেয়ালা নামিয়ে একগাল হেসে বলল, 'সে খবর কি ওর জানতে বাকি আছে? দুই বন্ধুতে কাল অত রাত্তির অব্দি গল্পগুজব করেছে।'

মেসো বললেন, 'প্রলয় চলে গেলে ওর এখানে একা থাকতে ভালো না লাগতে পারে।'

'বারে! খারাপ লাগবে কেন?' মাসি পাল্টা প্রশ্ন করল। শেষে বলল, 'এ বাড়িতে প্রলয় ছাড়া কি আর লোক নেই? নিলু আছে, স্বপ্ন আছে,—ক'টা দিন ওদের সঙ্গে হৈ-চৈ করে কাটিয়ে দেবে।'

একটু পরে থলি হাতে প্রলয় এসে ঢুকল। তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বলল, 'কিরে, ঘুম ভাঙল তোর?'

সুশান্ত সলজ্জ হাসল। বলল, 'যা ঠাণ্ডা এখানে। লেপের তলা থেকে বেরোতে ইচ্ছে করে না।'

'আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে।' প্রলয় জবাব দিল। বলল, 'সারা শীতকাল ঠাণ্ডা জলে আমি দিব্যি চান করি।'

'বলিস কি?' সুশান্ত যেন চমকে উঠল। শুধোল, 'এই কনকনে ঠাণ্ডা জলে তুই সত্যি স্নান করিস?'

'হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে।' প্রলয় মৃদু হাসল।

'আমার নির্ঘাত নিমোনিয়া হত।' সুশান্ত একটা আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল।

পিছন থেকে সুপ্তি বলল, 'ভয় নেই। তোমার জন্যে রোজ এক বালতি গরম জল মা বাথরুমে পাঠিয়ে দেবে।'

প্রলয় বোনকে ধমক দিল, 'অ্যাই, তুই চুপ কর দিকি। ফালতু ফোড়ন কাটছিস।'

'বারে! আমি অন্যায় কি বললাম?' সুপ্তি প্রায় রুখে দাঁড়াল। ফের বলল, 'ঠাণ্ডা জলে স্নান করে যদি নিমোনিয়া হয় তখন বাড়িসুদ্ধ লোককে যে ভুগতে হবে।'

বাজারের থলিটা সুপ্তির হাতে দিয়ে প্রলয় সোজা নিজের ঘরে চলে এল, পিছনে সুশান্ত।

চেয়ারে ধপাস করে বসে প্রলয় বলল, 'সকালে নাগরাজনদের বাড়ি যেতে চেয়েছিলি। তাহলে চল, এক চক্কর ঘুরে আসি।'

সুশান্ত চাপা গলায় জানাল, 'একটু আগে মেসোমশায় তোর কেরালা যাওয়ার কথা বলছিলেন।'

'হঠাৎ?'

'বোধহয় ওঁর মনে হয়েছে যে তুই চলে গেলে, এখানে আমার একা থাকতে ভালো লাগবে না।'

'আমি কেরালা যাচ্ছি শুনে তুই কি বললি?' প্রলয় জিজ্ঞাসা করল।

'কিছু না।' সুশান্ত মৃদুস্বরে জবাব দিল। 'এক মুহূর্ত চিন্তা করে জানাল, 'তবে একবার মনে হয়েছিল কথাটা ফাঁস করে দিই।'

'কি কথা?'

'তোর সঙ্গে কেরালা যেতে চাই।'

প্রলয় একটু ভেবে উত্তর দিল, 'না বলে হয়তো ভালো করেছিস। আগে নাগরাজনদের সঙ্গে কথা হোক। ওদের আপত্তি না থাকলে মায়ের কাছ থেকে মত আদায় করা সহজ হবে।'

সুশান্ত মাথার চুলে হাত বুলিয়ে চিন্তা শুরু করল। শেষ পর্যন্ত যদি নাগরাজনের আম্মা রাজি না হয় তাহলে কি উপায় হবে?

চেয়ার থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে প্রলয় বলল, 'আর দেরি নয়। চল তাহলে, আম্মার সঙ্গে কথা বলে আগে এর একটা ফয়সালা করে আসি।'

তিন

সাইকেলটা প্রলয় চালাচ্ছে। কেরিয়ারে সুশান্ত বসে। পুরানো গাড়ি, রাস্তার মধ্যে দুবার চেন খুলে গেল। বিরক্ত হয়ে সুশান্ত বলল, 'দূর! এর চেয়ে হেঁটে যাওয়া ঢের ভালো ছিল।'

প্রলয় হেসে জবাব দিল, 'যা ওজন তোর। সাইকেলটা তাই পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছে।'

সুশান্ত রাগল না। জুৎসই একটা উত্তর খুঁজছিল। শেষে খোঁচা দিয়ে বলল, 'আসলে তোর সাইকেলটা ঝড়ঝড়ে। বেচারা এবার রিটায়ার করতে চায়, বুঝলি?'

বাড়ির সামনে একটা ছেলে খুরপি হাতে ফুলগাছের পরিচর্যা করছে। উল্টোদিকে মুখ করে বসেছে বলে তাদের দেখতে পায় নি। সাইকেল থেকে মাটিতে পা নামিয়ে প্রলয় চিৎকার করে ডাকল, —'নাগরাজন।'

ঘাড় ফিরিয়ে সেই ছেলেটা একনজর তাকাল। পরক্ষণেই হাতের খুরপিটা নামিয়ে রেখে সোল্লাসে দৌড়ে এল। তার পরনে সাদা হাফ-প্যান্ট, গায়ে হাত-পুরো সোয়েটার। ভিতরে জামা কিংবা গেঞ্জি হবে। মিশমিশে না হলেও গাত্রবর্ণ কালো। কাছে এসেই সুশান্তকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল।

প্রলয় বলল, 'ও আমার মাসতুতো ভাই সুশান্ত, কলকাতায় থাকে। এর কথা তোকে কতবার বলেছি।'

নাগরাজন সলজ্জ হাসল। যেন সুশান্তকে সে চিনতে পেরেছে। তার চোখ দুটি উজ্জ্বল, মুখখানি মিষ্টি। মাথায় কোঁকড়া চুল, বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। হাত বাড়িয়ে প্রায় করমর্দনের ভঙ্গিতে সুশান্তর

ডানহাতের আঙুলগুলি টেনে নিয়ে সে বোধহয় তার আন্তরিকতার কথা জানাল।

সুশান্ত বলল, 'তুমি বাংলা জান তো?'

নাগরাজন পরিষ্কার জবাব দিল, 'নিশ্চয়।'

বন্ধুর সপক্ষে প্রলয় বলল, 'সাত-আট বছর খড়্গপুরে রয়েছে। তাই বাংলা বুঝতে ওর কোনো অসুবিধে হয় না, বলতেও পারে।'

সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কবে কেরালা যাচ্ছ?'

'যে কোনো দিন', নাগরাজন চটপট জবাব দিল। বলল, 'আপ্পা তো এখুনি রিজার্ভেশানের জন্য বেরুবে। মনে হয় চার পাঁচ দিন বাদেই আমরা রওনা হচ্ছি।'

'আপ্পা মানে?' সুশান্ত ঘাড় ফিরিয়ে প্রলয়ের মুখের দিকে তাকাল।

ওর অজ্ঞতা নিরসন করতে নাগরাজন ব্যাখ্যা করল, 'আপ্পা মানে ফাদার,—তোমরা যাকে বাবা বল।'

'বুঝেছি।' সুশান্ত সহাস্যে তাকাল।

প্রলয় আর বিলম্ব না করে আসল কথাটা পাড়ল! বলল, 'ভাবছি সুশান্তকেও আমাদের সঙ্গে কেরালা নিয়ে যাব।'

'সত্যি?' শুনে নাগরাজন যেন খুশিতে নেচে উঠল। দ্রুত এক পাক ঘুরে নিয়ে বলল, 'উঃ! কি দারুণ হবে, না?'

প্রলয়ের ভাবাবেগ কম, বিজ্ঞানের ছাত্রের মতো যুক্তি দিয়ে কথা বলতে ভালোবাসে। এক মুহূর্ত পরে সে মন্তব্য করল, 'কিন্তু আম্মার মতামতটা তো নিতে হয়।'

'হোয়াট এ ফুল!' নাগরাজন তাকে প্রায় নির্বোধ প্রতিপন্ন করে বলল, 'আম্মা কখনও অমত করতে পারে?'

অবশ্য তাই হল। সুশান্ত যেতে চায় শুনে আম্মা কি খুশি। এগিয়ে এসে তার গায়ে হাত রেখে আদর করল। ভণিতা না করে সোজাসুজি বলল, 'নিশ্চয় যাবে তুমি। একবার যখন এসে পড়েছ তখন তোমাকে ফেলে কি আমরা যেতে পারি?' ফের নাগরাজনকে

লক্ষ্য করে জানাল, 'তোর আপ্পাকে গিয়ে বল সুশান্তর জন্যেও একটা রিজার্ভেশান চাই। ও আমাদের সঙ্গে যাবে।'

শুরুতে সুশান্ত ভেবেছিল এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে খুব ঝামেলা হবে। খানিকটা ইংরেজী, কিছুটা বাংলা মিশিয়ে হয়তো মনের ভাব প্রকাশের চেষ্টা করবে। কিন্তু প্রথমে নাগরাজন তারপর আম্মাও তাকে রীতিমত চমকে দিয়েছে। এরা দিব্যি বাংলা বোঝে, বেশ বলতেও পারে। শুধু নিজেদের মধ্যে যখন কথা বলে তখন সেটা মালয়ালাম ভাষা,—তার এক বর্ণ সুশান্ত কিংবা প্রলয় কেউ বোঝে না।

দুটো ডিশে করে আম্মা তাদের মশলা ধোসা খেতে দিল। তার সঙ্গে স্টেনলেস স্টিলের গ্লাসে চা। সুশান্ত বাড়িতে খেয়ে এসেছে বলতেই আম্মা হেসে উঠল। বলল, 'সে কখন হজম হয়ে গেছে। তোমরা উঠতি বয়সের ছেলে, এখন তো ঘণ্টায় ঘণ্টায় ক্ষিদে পাবে।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সুশান্ত ফের প্রসঙ্গটা তুলল। প্রলয়কে লক্ষ্য করে বলল, 'যাব তো বলে এলি। কিন্তু নাগরাজনের বাবা যদি এরপর সত্যি আমার টিকিট কেটে রিজার্ভেশান করে রাখে?'

'এর মধ্যে যদি কেন? তোর রিজার্ভেশান নিশ্চয় করবে, আম্মা যখন বলেছে।' প্রলয় জবাব দিল।

'কিন্তু মাসি? ধর মাসি যদি বেঁকে বসে?'

'মা আপত্তি করতেই পারে। তার কারণ মাসিমা আর মেসোমশায় তোকে খড়্গপুরে ছুটি কাটাতে পাঠিয়েছে, কালিকটে যেতে পারমিশন দেয় নি।'

'কেরালায় পাঠাতে মা-বাবা রাজি হবে না।' সুশান্ত একটা হতাশ ভঙ্গি করে বলল। 'বরং জানতে পারলে লিখবে চটপট কলকাতায় ফিরে এস।'

'তাহলে কি করা যায়?' প্রলয় ভ্রূ কোঁচকাল। দু-চার সেকেণ্ড চিন্তা করে ফের বলল, 'বাড়িতে গিয়ে রিজার্ভেশানের কথা স্রেফ চেপে যাবি, বুঝলি?'

'কেন ?' সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল। বলল 'মাসি তাহলে নাগরাজনকে ডেকে আমার টিকিট কাটতে বারণ করবে, তাই না ?'

'হ্যাঁ, সেটাই স্বাভাবিক। কারণ তুই যাবি কিনা তাই তো ঠিক হয় নি। বরং ওরা যদি রিজার্ভেশান করে রাখে তাহলে ভালো। তারপর শেষ মুহূর্তে তোর যাওয়া ঠিক হলেও দিব্যি চলে যাবি।'

সুশান্ত তবু বলল, 'কিন্তু যাওয়াটা সেটলড হবে কেমন করে ? অন্ততঃ মাসিকে কথাটা বলতে হয়।'

'অবশ্য বলতে হবে।' প্রলয় তাকে প্রায় সমর্থন জানাল। মুচকি হেসে ফের মন্তব্য করল, 'কিন্তু তার জন্যে একটা সুযোগ চাই, বুঝলি ?'

'সুযোগ মানে চান্স ?'

'হ্যাঁ। দুম করে বলে বসলে হয়তো কোনো কাজ হবে না। মা একবাক্যে নাকচ করে দিতে পারে।'

সুশান্তকে যেন কিঞ্চিৎ অসহায় দেখাল। ঈষৎ দুর্বল কণ্ঠে সে বলল, 'তোর সঙ্গে কেরালায় যাওয়া আমার কপালে নেই, বুঝলি ?'

প্রলয় তাকে উৎসাহিত করল, 'এতে মুষড়ে পড়লে চলে ? তুই ভাবছিস কেন ? মাকে ঠিক আমি রাজি করতে পারব।' এক মুহূর্ত থেমে ফের বলল, 'দেখবি, কাল রাত্তিরে কিংবা পরশু দুপুরবেলা সব সেটলড্ হয়ে যাবে।'

'মাসি অমত করলে আমি কিন্তু কালই কলকাতা চলে যাব।' সুশান্ত ঈষৎ অভিমানের সঙ্গে জানাল। বলল, 'তোকে যখন যেতে দিচ্ছে তখন আমার বেলায় আপত্তি করবার কোনো মানে হয় ?'

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল। রাত্তিরবেলা খাওয়ার পাট চুকলে দুজনে গিয়ে কথাটা পাড়বে। এই সময়টা মানুষের মন-মর্জি একটু প্রফুল্ল হয়। অন্য কিছু নয়, প্রলয় থাকবে ভেবেই তো সুশান্ত খড়্গাপুরে বেড়াতে এসেছে। সে কেরালা যাবে জানলে সুশান্ত কখনও এখানে আসতে রাজি হয় ? আর প্রলয় চলে গেলে খড়্গাপুরে একলা পড়ে

থাকতে তার নিশ্চয় ভালো লাগবে না। সুতরাং তাদের দুজনকে একসঙ্গে যেতে দিলেই তো ঝামেলা মিটে যায়।

কিন্তু সন্ধ্যের আগেই সব ফাঁস হয়ে গেল। উঃ, নাগরাজনের ঘটে যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে। অন্ধকার তখনও হয়নি। শীতের বেলা। রোদ কখন খোলস-খসা সাপের মতো নিস্তেজ হয়ে মাটির বুক থেকে প্রায় মুছে যাচ্ছে। সাইকেল চালিয়ে নাগরাজন সোজা তাদের বাড়ির কাছে এসে নামল। দেয়ালের গায়ে গাড়িটা ঠেসিয়ে রেখে এক লাফে বারান্দায় উঠে প্রায় ঘোষণা করল—রিজার্ভেশান হয়ে গেছে।

প্রলয়ের বাবা তখন বাড়িতে। খবর শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'কোন্ গাড়িতে হল?'

'ওয়ান ফর্টি-ওয়ান আপ,—করমণ্ডল এক্সপ্রেস। চারটে বার্থ,—একটা লোয়ার, দুটো মিডল আর একটা আপার।' নাগরাজন এক নিশ্বাসে বলে গেল।

ছেলেটার গলার জোর আছে। তারপর উৎসাহে সে প্রায় চেঁচিয়ে কথা বলছিল। রিজার্ভেশানের কথা শুনে প্রলয়ের ছোট বোন সুপ্তি ঘরের ভিতর থেকে বারান্দায় চলে এল। চোখ দুটি বড়ো বড়ো করে জিজ্ঞাসা করল, 'চারটে বার্থ আবার কেন নাগরাজনদা? তোমরা তো তিনজনে যাচ্ছ। আম্মা, তুমি আর দাদা।'

'বাবে! তিনজন কেন বলছ? তোমার আর একজন দাদা মানে সুশান্তও তো আমাদের সঙ্গে কাটাঙ্গালে যাবে। আজ সকালে ওরা দুজন গিয়ে আম্মাকে বলে এসেছে।'

সুপ্তির যেন ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাই কখনও হয়? সুশান্তদার তো সেখানে যাওয়ার কথা হয়নি। কিন্তু এমন একটা সংবাদ মাকে না জানালে তার স্বস্তি নেই। এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে সে বলল, 'ও মা, সুশান্তদাও কেরালায় যাচ্ছে!'

প্রলয়ের মা রাত্তিরে শোবার বিছানা করছিল। মেয়ের কথা শুনে

খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'দূর বোকা! তাই কখনও হয়? তোর সঙ্গে দাদারা ঠাট্টা করেছে।'

'ঠাট্টা নয়।' সুপ্তি হাত নেড়ে মাকে বোঝাতে চেষ্টা করল। বলল, 'নাগরাজনদা, এইমাত্তর এসে খবর দিল। সুশান্তদার রিজার্ভেশান হয়ে গেছে।'

'সে কি?' প্রলয়ের মা বেশ অবাক হয়েছে মনে হল।

সুপ্তি বলল, 'দেখবে চল, বারান্দায় দাঁড়িয়ে নাগরাজনদা বাবার সঙ্গে কথা বলছে। তুমি জিজ্ঞাসা করলেই সব জানতে পারবে।'

বিছানার চাদর ফেলে প্রলয়ের মা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। হ্যাঁ, সুপ্তি তো মিথ্যে বলেনি। বারান্দায় নাগরাজন, প্রলয়, সুশান্ত এবং তার স্বামী দাঁড়িয়ে। বোধহয় টিকিটের রিজার্ভেশান নিয়ে ওদের মধ্যে কথা হচ্ছে।

প্রলয়ের মা জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে, সুশান্তর জন্যেও নাগরাজনের বাবা নাকি বার্থ রিজার্ভেশান করেছে?'

ছেলে কোনো জবাব দেবার আগেই তার বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, শুনলাম সুশান্তর নাকি কেরালায় যেতে খুব ইচ্ছে। তাই দুই বন্ধু মিলে সকালে ওদের বাড়িতে গিয়ে সে কথা বলে এসেছে।'

'ওমা! তা কেমন করে হবে?' প্রলয়ের মা যেন প্রতিবাদ করে উঠল, 'দিদি-জামাইবাবু তো আর ওকে কেরালায় যাবে বলে এখানে পাঠায় নি?'

অকাট্য যুক্তি। তবু বুদ্ধি খাটিয়ে প্রলয় একটা পাল্টা জবাব খাড়া করল। বলল, 'আমি সেখানে যাচ্ছি শুনলে মাসিমা আর মেসোমশায় নিশ্চয় আপত্তি করবে না।'

'উঁহু।' প্রলয়ের মা স্পষ্ট জানাল, 'না বলে-কয়ে পরের ছেলেকে অত দূর দেশে পাঠাতে আমি রাজি নই বাপু।'

'ওকে কেরালায় যেতে না দিলে সুশান্ত কিন্তু তল্পিতল্পা গুটিয়ে

কালই কলকাতায় ফিরে যাবে।' প্রলয় তার মাকে লক্ষ্য করে প্রায় একটা আলটিমেটাম ছুড়ে দিল।

প্রলয়ের বাবা বেশ ভালোমানুষ। ঈষৎ চিন্তিতমুখে বললেন, 'এ তো বিষম সমস্যা হল দেখছি।'

'সমস্যা হলেও কোনো উপায় নেই। জামাইবাবু কি রকম লোক তা তো জান? তাঁর অমতে সুশান্তকে কেরালায় পাঠিয়েছি শুনলে আমাকে ছেড়ে কথা কইবেন না।'

সুশান্ত এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল, তার মুখ দিয়ে একটি শব্দও বের হয় নি। এবার মাসির কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'আচ্ছা, কেরালায় যাবার কথা মা-বাবাকে নাই বা জানালে? দিন পনের বাদেই তো আমরা ফিরে আসছি।'

'দস্যি ছেলে! তাই কখনও হয়?' মাসি ওকে আদর করে কাছে টেনে নিল। বলল, 'অন্ততঃ দিদিকে না জানিয়ে তোকে কিছুতেই সেখানে পাঠাতে পারব না।'

কয়েক মুহূর্ত সকলেই চুপ। ব্যাপারটা যেন ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। অগত্যা নাগরাজনকে উদ্দেশ্য করে প্রলয়ের বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'রিজার্ভেশানটা কোন্ তারিখের?'

'ফিফথ্ ডিসেম্বর, মানে শুক্রবার। ওই দিন সন্ধ্যেবেলা গাড়িতে উঠব।' সে চটপট জবাব দিল।

'আজ হল গিয়ে সেকেণ্ড ডিসেম্বর, মঙ্গলবার। তার মানে মাঝখানে আর দুটো দিন, কি বল?' সুশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বোধহয় এবার সমাধানের কথা ভাবতে শুরু করলেন।

প্রলয়ের মা বলল, 'দুটো দিনের মধ্যে তো আর চিঠি লিখে সেখান থেকে জবাব পাবে না। নাহলে দিদিকে ব্যাপারটা জানিয়ে তার মত চেয়ে নিতাম।'

সুপ্তি বলল, 'কলকাতায় এখন কেউ যাবে না মা? তাহলে তার হাতেও তো একটা চিঠি দিতে পার।'

প্রলয়ের বাবা হেসে বললেন, 'গুড্ আইডিয়া। তাহলে কাল একবার খোঁজ নিয়ে দেখি কেউ কলকাতা যাবে কি না। তার হাতে একটা চিঠি পাঠিয়ে জবাবের অপেক্ষা করি।'

কিন্তু ব্যবস্থাটা যেন সুশান্তর মনঃপূত হল না। সে শুকনো মুখ করে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল।

নাগরাজন বলল, 'সুশান্ত না গেলে আম্মা কিন্তু খুব দুঃখ পাবে।' এক মুহূর্ত থেমে ফের অনুনয় করল, 'ওকে বরং তুমি পাঠিয়ে দাও আন্টি।'

'আমার তো পাঠাতে আপত্তি নেই বাবা।' মাসি সস্নেহে তাকাল। তারপর সুশান্তর মুখে এক পলক নজর বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'কিন্তু ওর মা-বাবার তো একটা মতামত চাই।'

'আচ্ছা, আচ্ছা। আমি দেখছি চেষ্টা করে।' প্রলয়ের বাবা যেন সকলকে আশ্বস্ত করলেন। মিষ্টি হেসে সুশান্তর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'ডোণ্ট বি আপসেট। প্রলয়ের সঙ্গে তোমাকে কেরালায় পাঠাতে আমাদের নিশ্চয় আপত্তি নেই।'

পরদিন বিকেলে বাড়ি ফিরে ভদ্রলোক কিন্তু একটা হতাশ ভঙ্গি করলেন।

প্রলয়ের মা বললেন, 'কি গো, কলকাতায় আজ বুঝি কেউ গেল না?'

'উঁহুঁ। তেমন লোক পেলাম কই?'

'তাহলে উপায়? মাঝে তো আর মোটে একটা দিন। এর মধ্যে কেউ গিয়ে খবর আনতে পারবে?'

'ভাবছি কাল তোমার জামাইবাবুর অফিসে একটা টেলিফোন করব। চিঠি-চাপাটির চেয়ে তাতে বরং কাজ হবে।'

'যা হয় একটা কিছু কর বাপু।' প্রলয়ের মা এবার ব্যাখ্যা করে জানাল, 'সুশান্ত তো কাল থেকে গুম হয়ে আছে। রাত্তিরে ভালো করে খেল না। প্রলয়ের সঙ্গে ওকে কেরালায় না পাঠালে ও কিন্তু

ঠিক কলকাতা পালাবে। জন্মে আর কখনও মাসির বাড়ি আসবে না।'

কিন্তু পরদিনও কিছু সুরাহা হল না। বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে ভদ্রলোক তেমনি হতাশ ভঙ্গি করলেন।

প্রলয়ের মা শুধোল, 'কিগো, জামাইবাবুকে টেলিফোনে পেলে না?'

'পাব কেমন করে?' গায়ের কোটটা খুলে রেখে একটা চাদর জড়িয়ে নিয়ে ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'কলকাতার লাইন খারাপ। শুনলাম সারানো হচ্ছে। কাল বিকেল নাগাদ হয়তো ঠিক হতে পারে।'

'সর্বনাশ! তাহলে কি হবে? এদিকে নাগরাজনের বাবা তো সুশান্তর রিজার্ভেশান করে বসে আছে!'

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রলয় বোঝাল, 'মিছিমিছি কেন আপত্তি করছ মা? মোটে দশ-বারো দিনের ব্যাপার, ও দেখতে দেখতে কেটে যাবে। কেরালা থেকে ফিরে মাসিমা আর মেসোমশায়কে সব জানিয়ে দিলেই কোনো ঝামেলা থাকবে না।'

প্রলয়ের মা তবু খুঁতখুঁত করল। স্বামীকে লক্ষ্য করে বলল, 'কাজটা বোধহয় ভালো হবে না, বুঝলে? জামাইবাবু শুনলে খুব রাগারাগি করবেন কিন্তু।'

প্রলয় ফের সেই তুরুপের তাসটি বের করল। বলল, 'কেরালায় যেতে না দিলে সুশান্ত কিন্তু কাল দুপুরের ট্রেনেই কলকাতা ফিরে যাবে।'

প্রলয়ের বাবা বললেন, 'দিন দশ-বারো না হয় ঘুরেই এল। তোমার দিদি-জামাইবাবু জানবে সুশান্ত এখানেই ছিল।'

'তারপর? বিদেশ-বিভুঁয়ে ছেলেটার যদি অসুখ-বিসুখ করে? কিংবা হঠাৎ কোনো বিপদ-আপদ ঘটে? তখন ওর মা-বাবাকে কি কৈফিয়ত দেবে বল?'

প্রলয় জানাল, 'অসুখ-বিসুখ, বিপদ-আপদ তোমার ছেলেরও তো হতে পারে।'

বিরক্ত হয়ে তার মা বলল, 'তোমাদের যা ইচ্ছে হয় কর। আমি এর মধ্যে নেই বাপু।'

সন্ধ্যের পর আম্মা তাদের বাড়িতে এল, নাগরাজন সঙ্গে।

প্রলয়ের মা যথারীতি অভ্যর্থনা করল। পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে বসাল।

'কি ব্যাপার?' কোনোরকম ভণিতা না করেই আম্মা বলল, 'সুশান্তকে পাঠাতে আপনি নাকি খুব আপত্তি করছেন?'

'ঠিক আপত্তি নয়, জানেন? আসলে ওর মা-বাবাকে না জানিয়ে অতদূরে পাঠাতে একটু ভয় করছে।'

'মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন।' আম্মা তাকে আশ্বস্ত করে বলল, 'সুশান্ত নিশ্চয় সেখানে একা যাচ্ছে না। আরো দুটো ছেলে সঙ্গে যাবে।'

'সে কথা ঠিক। তবু—'

'তাহলে আপত্তি কিসের? তিনটি ছেলেকেই আমি চোখে চোখে রাখব। কাটাঙ্গাল খুব ছোট জায়গা। সেখানে আমার নজর এড়িয়ে ওরা কত দূরে যেতে পারে?'

প্রলয়ের মা চুপ করে রইল।

আম্মা বলল, 'ছেলেটার খুব যাবার ইচ্ছে। না যেতে দিলে ওর কিন্তু মন খারাপ হবে। তখন রাগ করে, হয়তো কলকাতায় ফিরে যেতে পারে।'

'কিন্তু ওর মা-বাবা শুনলে?'

'শুনলেই বা কি হবে? ছেলেটাকে তো আর আপনি জলে ভাসিয়ে দেন নি। আমার সঙ্গে কেরালায় যাবে আবার দশ-বারো দিন বাদেই ফিরে আসছে। বরং ওর বয়সে এরকম একটা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে।'

আম্মা নাগরাজনকে পাঠিয়ে সুশান্তকে তাড়াতাড়ি ডেকে আনল। বলল, 'রাত্তিরেই জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখ। দিনের বেলা হৈ-হট্টগোলে কত রকম ভুল ভ্রান্তি হতে পারে।'

প্রলয় বাজারে গিয়েছিল। সে ঘরে ঢুকতেই আম্মা বলল, 'সুশান্তকে কেরলে পাঠাতে তোমার মা রাজি হয়েছেন, বুঝলে? এখন দুই ভাই মিলে জামা-কাপড়, অন্য জিনিসপত্র সব গুছিয়ে ফেল।'

প্রলয় এক মুহূর্ত মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ছুটে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'মা সত্যি?'

তার মা হেসে বলল, 'অগত্যা। সুশান্তকে তোর সঙ্গে না পাঠিয়ে উপায় আছে? পরশু রাত্তির থেকে মুখ শুকনো করে ঘুরছে। কারো সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না। তারপর হঠাৎ কলকাতায় ফিরে গেলে দিদি-জামাইবাবু কি ভাববে?'

সুশান্ত কাছে এসে বলল, 'তুমি চিন্তা ক'র না মাসি। কাটাঙ্গালে গিয়ে আমরা একটুও দুষ্টুমি করব না। সব সময় আম্মার কথা শুনে চলব।'

উত্তেজনায় দুজনেই অস্থির। রাত্তিরে চোখে আর ঘুম আসে না। দু-ঘণ্টা ধরে জিনিসপত্র সব গোছানো হল। একটা সুটকেস জামা-কাপড়ে ঠাসা। আরো দুটো থলি। ব্যাগে প্রলয় তার টেলিস্কোপ, বাইনোকুলার এবং নিজের হাতে বানানো সেই রেডিও-রিসিভিং সেটটা নিয়েছে। এ ছাড়াও একটা শক্তিশালী টর্চ, ছ-ইঞ্চি ছুরি আর হাত দশ-বারো বেশ মোটা দড়ি থলিতে ভরে নিল। অন্য ব্যাগে পায়ের চটি, রাত্তিরে ট্রেনে ঘুমোবার জন্যে পাজামা, পথে গায়ে দেবার দুখানা র‍্যাগ,—টুকিটাকি আরো জিনিসপত্রে সেটা বোঝাই করল।

সুশান্ত একবার বলল, 'হ্যাঁরে, তোর এই রেডিও-সেট, টেলিস্কোপ আর বাইনোকুলার সেখানে কি কাজে লাগবে?'

'লাগতেও তো পারে।' প্রলয় কেমন হেঁয়ালি করে জবাব দিল। কয়েক সেকেণ্ড কি যেন চিন্তার পর বলল, 'নাগরাজনদের বাড়ির কাছে পাহাড়ের মাথায় একটা আলো জ্বলে, সে কথা তোকে লিখেছিলাম মনে আছে?'

'হ্যাঁ, লাল রঙের আলো। সন্ধ্যের পর থেকে ঘণ্টা দুই নাকি সেটা দেখা যায়।'

'ঠিক বলেছিস। কিন্তু মাসে দু-একবার ওই লাল আলোটা সবুজ হয়ে ওঠে। কয়েকটা দিন অমনি থাকে। তারপর আবার যথাপূর্বম্— সবুজ আলোর বদলে আগের সেই লাল আলো জ্বলতে থাকে।'

সুশান্ত বলল, 'পাহাড়ের মাথায় লাল কিংবা সবুজ আলো জ্বলল, —তাই নিয়ে তোর এত মাথাব্যথা কিসের ?'

প্রলয় গম্ভীর মুখে জবাব দিল, 'তোকে লিখেছিলাম মনে আছে ? পাহাড়ের মাথায় একটা পাগলাটে ধরনের আধবুড়ো লোক থাকে ?'

'হ্যাঁ, কাঠের একটা ঘর বানিয়ে সে একা বাস করে। নিজের কিছু বই পত্তর আর যন্ত্রপাতি নিয়ে দিন কাটায়।'

প্রলয় বিজ্ঞের মতো জবাব দিল, 'ওই লাল-সবুজ আলোর সঙ্গে এই লোকটার নিশ্চয় কোনো সম্পর্ক আছে। আমার মনে হয় সমস্ত ঘটনার পিছনে একটা গভীর রহস্য লুকিয়ে রয়েছে।'

'তুই কি সেই রহস্যের কিনারা করতে কাটাঙ্গালে যাচ্ছিস ?'

'খানিকটা তাই।' প্রলয় অকপটে জানাল। বলল, 'ব্যাপারটা আমাকে জানতেই হবে। কে ওই লোকটা ? পাহাড়ের চূড়ায় কেন সে অমন একলা পড়ে থাকে ? আর ওই লাল-সবুজ আলো তাহলে কিসের সঙ্কেত ?'

সুশান্ত মুচকি হেসে বলল, 'তোর এই মতলবের কথা মাসি জানতে পারলে কিন্তু দুজনের কেরালায় যাওয়া এখুনি ক্যানসেল হয়ে যাবে।'

ঠোঁটের ওপর আঙুল ঠেকিয়ে প্রলয় তাকে কথা কইতে নিষেধ করল। কয়েক মুহূর্ত পরে বলল, 'অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে তোর যাওয়ার পারমিশন হয়েছে। এখন বেফাঁস কিছু বলে যেন সব ভেস্তে দিস নে।'

সন্ধ্যেবেলা প্ল্যাটফর্মে সকলেই তাদের গাড়িতে তুলে দিতে এল।

প্রলয়ের মা-বাবা, নিলয় আর সুপ্তি,—ওদিকে নাগরাজনের আব্বাও সী-অফ করতে এসেছেন।

প্রলয়ের মা বার বার বলল, 'কাটাঙ্গালে গিয়ে সাবধানে থেক। আম্মার কথামত চলবে, বুঝলে?'

ওদের হয়ে আম্মা উত্তর দিল, 'বেশী চিন্তা করবেন না ভাই। আমার কাছে ওরা ঠিক থাকবে। আর দশ-বারো দিন বাদেই তো সবাই ফিরে আসছে।' মৃদু হেসে ফের জানাল, 'ক্যালেণ্ডারের তারিখগুলো দেখবেন ঝরা পাতার মতো কখন খসে পড়েছে।'

প্রলয়ের মা তবু অনুরোধ করল, 'নিজের ছেলের জন্য বলছি না। কিন্তু আমার বোনপোটিকে একটু নজরে রাখবেন। ওর জন্যেই যত চিন্তা।'

'শুধু আপনার বোনপো নয়। তিনজনের ওপরেই ভালোমত নজর রাখতে হবে। নইলে এই তিনমূর্তি জোট বেঁধে কখন যে কি অঘটন বাধিয়ে বসে তার কিছু ঠিক আছে?'

গাড়ি ছাড়ল। প্ল্যাটফর্মে সকলে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। সুশান্ত লক্ষ্য করল মাসির মুখটা ম্লান, ছলছলে চোখ—যেন জল চিকমিক করছে।

শেষবারের মতো মাসি বোধহয় আরো কিছু বলতে চাইল। কিন্তু ততক্ষণে ট্রেন সবেগে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে প্রায় স্টেশনের বাইরে চলে এসেছে।

চার

এতক্ষণ ট্রেনের মধ্যে একটা ভিড়, মানুষজনের ওঠানামা চলছিল। গাড়ি ছাড়তেই কামরাটা বেশ ফাঁকা লাগল। ইতিমধ্যে যে যার সীট খুঁজে নিয়ে বসে পড়েছে। দু-চারজন যাত্রী সম্ভবতঃ রিজার্ভেশান জোগাড় করতে পারেনি। তারা কালো-কোট পরা কণ্ডাক্টর গার্ডের পিছনে ছিনে জোঁকের মতো লেগে আছে। হাতে রিজার্ভেশান চার্ট নিয়ে মোটা মতন সেই লোকটা সীটে উপবিষ্ট যাত্রীদের নাম জেনে টিকিট পরীক্ষা করে তার লিস্টের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছে। কামরার করিডোর দিয়ে কফির পাত্র নিয়ে একজন হকার যাচ্ছিল। সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বিচিত্র স্বরে হাঁক দিল, 'কফে,···সাউথ ইণ্ডিয়ান কফে।'

নাগরাজন বলল, 'করমণ্ডল সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস,—তাই ভাড়া বেশী। আগে খড়্গপুরে স্টপেজ ছিল না। আমরা তখন লোক্যাল ট্রেনে উঠে হাওড়া গিয়ে গাড়ি ধরতাম।'

সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'হাওড়া ছেড়ে ট্রেন তখন কোথায় গিয়ে থামত?'

নাগরাজন জবাব দিল, 'ভুবনেশ্বরে একবার ধরত রাত্তিরে, কিন্তু সেটা রানিং স্টাফ বদল করবার জন্যে। গাড়ি খুব ভোরবেলায় ওয়ালটেয়ারে গিয়ে দাঁড়াত।'

সুশান্ত খুব অবাক হয়ে বলল, 'হাওড়া থেকে সোজা ওয়ালটেয়ার? সে তো অনেকখানি রাস্তা।'

'হ্যাঁ, প্রায় আট'শ আশী কিলোমিটার। তার মানে সাড়ে পাঁচ'শ মাইল। ওয়ালটেয়ার ছেড়ে দুপুরবেলায় বিজয়ওয়াড়া,—তারপর সন্ধ্যের মুখে মাদ্রাজ সেন্ট্রালে—গন্তব্যস্থলে পৌঁছত।'

প্রলয় বলল, 'রেলে কলকাতা থেকে মাদ্রাজের দূরত্ব দিল্লীর চেয়ে বেশী। প্রায় এক হাজার চল্লিশ মাইলের মতো।'

সুশান্ত জানতে চাইল, 'আগের থেকে স্টপেজ এখন বেশী দিয়েছে বুঝি?'

নাগরাজন বলল, 'বেশী মানে আরো তিনটে স্টেশনে গাড়ি থামে। হাওড়া ছেড়ে খড়্গপুর—তারপর ভুবনেশ্বর। সেখান থেকে ওয়ালটেয়ার—সকাল ন'টা নাগাদ রাজামাণ্ড্রীতে দাঁড়ায়। শেষে বিজয়ওয়াড়া ছেড়ে সন্ধ্যের পর মাদ্রাজ সেণ্ট্রালে গিয়ে পৌঁছবে।'

বাইরে বেশ শীত। কামরার ভিতর কোথাও জানালা খোলা ছিল বলে ঠাণ্ডা বাতাস শত্রুপক্ষের গুপ্তচরের মতো নিঃশব্দে গাড়িতে ঢুকে পড়েছে। সার্সী টেনে নামাতেই উষ্ণতা ধীরে ধীরে ফিরে এল। যাত্রীরা নানা কাজে নিবিষ্ট হচ্ছিল। কেউ খবরের কাগজের পাতা খুলে মনোযোগ সহকারে পড়তে শুরু করল। কেউ সময় কাটানোর জন্য গল্পের বই বেছে নিল।

গাড়িতে উঠেই আম্মা সকলকে গায়ে চাদর জড়িয়ে নিতে বলেছিল। অন্ততঃ কান আর গলা ঢেকেঢুকে রাখতে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগলে মিছিমিছি কয়েকটা দিন বিছানায় শুয়ে কাটাতে হতে পারে।

ইতিমধ্যে বেয়ারা গোছের একটা লোক এসে সামনে দাঁড়াল। তার হাতে কাগজ আর পেন্সিল। অন্য কিছু নয়, রাত্তিরের খাবারের অর্ডার নিতে এসেছে। তিন বন্ধুর জন্য আম্মা চিকেন-কারী, রাইস অর্ডার দিল। সুশান্ত তাই শুনে বেজায় খুশি। আম্মা কিন্তু নিজের খাবারের কথা বলে নি।

প্রলয় জিজ্ঞাসা করল, 'আম্মা, তোমার জন্যে এক প্লেট অর্ডার দিলে না?'

আম্মা মাথা নাড়ল। বলল, 'বাড়ি থেকে লুচি-তরকারি নিয়ে এসেছি। একটা রাত্তির ওতেই চলে যাবে। ভারি সুন্দর হেসে ফের

বলল, 'তোমরা খাও বাবা। ট্রেনের খাবার আমি মুখে দিতে পারি না।'

ঘুম ভাঙল বেশ ভোরে। সুশান্তের মনে হল ট্রেন কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে অস্পষ্ট কলরব কানে যেতেই সে মিডল বাঙ্ক থেকে উটের মতো গলাটা সামান্য বের করে কাচের জানালার ওপর চোখ রাখল। হ্যাঁ, গাড়ি তো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। নাগরাজন তাহলে ঠিকই বলেছিল। ট্রেনটা সম্ভবতঃ ওয়ালটেয়ার স্টেশনে এসে থেমেছে।

বাঙ্ক থেকে নিঃশব্দে নিচে নামল সে। তাকিয়ে দেখল নাগরাজন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। প্রলয় আপার বার্থে শুয়েছিল। সুশান্ত মাথা তুলতেই দুজনের চোখাচোখি হল।

'জেগে আছিস?'

'হ্যাঁ', মুচকি হেসে প্রলয় জবাব দিল। পাল্টা প্রশ্ন করল, 'এত ভোরে যে ঘুম ভাঙল তোর?'

বেশ ঠাণ্ডা। চাদরটা গায়ে জড়িয়ে সুশান্ত জানাল, 'ট্রেনে আর কতক্ষণ ঘুমোব বল? রাত্তিরে গাড়ি যা স্পীডে এসেছে! মাঝে মাঝেই তো ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল।'

পায়ে চটি গলিয়ে সে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে গাড়ির ভিতর অনেকে শয্যা ছেড়ে উঠে বসেছে। কারো বা চুল-টুল আঁচড়ে রীতিমত ফিটফাট বেশ। একজন ভদ্রলোক দাঁত মেজে কুলকুচো করছিলেন। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে তিনি প্ল্যাটফর্মে নেমে এক কাপ কফি কিনে পাত্রে চুমুক দিলেন। সুশান্ত পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল গায়ে চাদর জড়িয়ে প্রলয় কখন উঠে এসেছে। সুশান্ত ঘাড় ফেরাতেই বলল, 'প্ল্যাটফর্মে নামবি? গাড়ি এখানে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট দাঁড়ায়।'

দুজনে চটপট নিচে নামল। চারদিক বেশ ফাঁকা,···স্টেশনে লোকজন কম। এই কাক-ডাকা ভোরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে কে আর বিছানা ছেড়ে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াবে?

প্রলয় হঠাৎ বলল, 'একটা জায়গার তিনটে নাম হতে পারে জানিস ?'

'দূর ! তাই কখনও হয় ?' সুশান্ত সন্দেহ প্রকাশ করল।

প্রলয় বলল, 'কেন ? এই ওয়ালটেয়ারেরই তো তিনটে নাম আছে। স্টেশন আর টাউনের নাম ওয়ালটেয়ার,—বন্দরের নাম বিশাখাপত্তনম্ আর এয়ারপোর্টের নাম ভাইজাগ্। সবই কিন্তু এক জায়গায়।'

'আহা ! ওরকম তো অনেক নাম হয়।' সুশান্ত পাল্টা তর্ক করল। বলল, 'যেমন ধর কলকাতায়। শহরটার নাম কলকাতা, এয়ারপোর্টের নাম দমদম আর বন্দরের নাম খিদিরপুর।'

'আজ্ঞে না। খিদিরপুর বন্দর নয়, ওটা ডক। বন্দর হল কলকাতা, বিদেশীরা যাকে ক্যালকাটা পোর্ট বলে।'

অকাট্য যুক্তি। কোনো জবাব দিতে না পেরে সুশান্ত শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ দূরে কি যেন লক্ষ্য করে প্রলয় বলল, 'গাড়িতে ওঠ, এখুনি ট্রেন ছাড়বে। সিগন্যালের লাল আলোটা কখন হলুদ হয়ে গেছে খেয়াল করিনি।'

গাড়ির ভিতর ঢুকে সুশান্ত দেখল আম্মা উঠে রাত্তিরে শোবার জন্য বের করা চাদর এয়ারপিলো ইত্যাদি গুছিয়ে ব্যাগে ভরে নিচ্ছে। নাগরাজন তখনও ঘুমিয়ে। প্রলয় পা টিপে টিপে তার কাছে গিয়ে একটা কাণ্ড করল। হাতের তোয়ালের প্রান্তভাগের অল্প অংশ সরু করে পাকিয়ে নাগরাজনের নাসারন্ধ্রের মধ্যে ঈষৎ সুড়সুড়ি দিতেই সে বিকট একটা হাঁচির শব্দে চারদিক চমকিত করে উঠে বসল।

ছেলেকে ধমক দিয়ে আম্মা বলল, 'বাঙ্ক থেকে নেমে আয় দিকি। সমস্ত রাত্তির যা নাক ডাকিয়ে ঘুমোলি।'

সুশান্ত মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'ঘুমোলে ওর নাক ডাকে বুঝি ?'

'কখনও না।' নাগরাজন তীব্র প্রতিবাদ জানাল। প্রলয় বলল, 'নাক ডাকে কিনা সেটা তুই বুঝবি কেমন করে?'

'বারে! আমার নাক ডাকছে কিনা সেটা আমি বুঝতে পারব না?'

'কেমন করে বুঝবে?' সুশান্ত তাকে পাল্টা প্রশ্ন করল। ফের হেসে বলল, 'তখন যে তুমি ঘুমে অচেতন।'

অর্ডার দিতেই ব্রেকফাস্ট চলে এল। প্রত্যেকের জন্য দু-পিস পাউরুটি-মাখন, একটা ডিমের ওমলেট আর চা। আম্মা বলল, 'খিদে থাকলে আরো চেয়ে নাও।'

সুশান্ত মাথা নেড়ে জবাব দিল, 'আম্মা, ফার্স্ট রাউণ্ডে এই ঢের। বেলা হলে না হয় আর এক রাউণ্ড অর্ডার দেওয়া যাবে।'

নাগরাজন জানাল, 'লাঞ্চ দেবে সেই বিজয়ওয়াড়ায়। তার মানে বেলা বারোটা। তার আগে নিশ্চয় আর এক প্লেট খেতে হবে।'

রাজামাণ্ড্রী স্টেশনে গাড়ি এসে পৌঁছল ন'টা নাগাদ। করমণ্ডল এক্সপ্রেস এখানে মাত্র দু-তিন মিনিট দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ বাদে ট্রেন গোদাবরী নদীর ব্রিজে উঠল। কি বিশাল নদীটা। সুশান্ত গাড়ির জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে লক্ষ্য করছিল। শীতকাল হলেও নদীতে বেশ জল, পাল খাটিয়ে নৌকো চলছে। জেলে ডিঙিতে কিছু লোক মাছ ধরতে ব্যস্ত।

প্রলয় বলল, 'হাঁ করে কি দেখছিস? এই তো সেই গোদাবরী নদী। সংস্কৃতে পড়িসনি,—অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু। শাল্মলী শব্দের মানে জানিস তো? শাল্মলী মানে শিমূল গাছ।'

সুশান্ত কথা বলল না। তার দুটি চোখ নদীর তীরে সংস্কৃতে পড়া এক বিরাট শিমূল গাছের সন্ধান করে ফিরছিল।

প্রলয় আরো যোগ করল, 'দক্ষিণ ভারতের লোকেরা গোদাবরীকে উত্তর ভারতের গঙ্গার মতো পবিত্র নদী বলে জ্ঞান করে। প্রায় ন'শ মাইল লম্বা এই নদী নাসিক জেলা থেকে উৎপন্ন হয়ে ভারতের পূর্ব উপকূলে সমুদ্রে এসে পড়েছে।'

ট্রেন বেগে ছুটছে। ডান দিকে বহুদূরে পরিদৃশ্যমান পূর্বঘাট পর্বতমালা যেন এই যন্ত্রদানবটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। নাগরাজন যা বলেছিল তাই। বিজয়ওয়াড়ায় যখন গাড়ি এসে ঢুকল তখন ঘড়িতে প্রায় বারোটা বাজে। প্যানট্রি-কার থেকে বিজয়ওয়াড়াতেই লাঞ্চ দিয়ে গেল। সুশান্ত ফিস-কারি খেতে চেয়েছিল। কিন্তু যে লোকটি অর্ডার নিতে এল, সে পরিষ্কার জানিয়ে দিল এগ-কারি রাইস ছাড়া এবেলা আর কিছুই সার্ভ করতে পারবে না। অগত্যা তাই—তিন প্লেট এগ-কারি রাইস। তাদের সঙ্গে আম্মাও লাঞ্চ খেল। তবে সেটি সম্পূর্ণ ভেজিটেরিয়ান। নাগরাজন বলল, 'আম্মা তো আণ্ডা খাবে না। ফিস-কারি হলে নিশ্চয় নন-ভেজ অর্ডার দিত না।'

বিজয়ওয়াড়া পিছনে ফেলে গাড়ি আবার স্পীড নিল। সামনেই কৃষ্ণা নদী। নিচে সফেন জলরাশি রেলওয়ে ব্রিজের বিশালকায় থামগুলির পাশ দিয়ে মোহনার দিকে ছুটে চলেছে। গোদাবরীর মতো কৃষ্ণা অত প্রশস্ত নয়, কিন্তু সুশান্তর মনে হল স্রোতের বেগ এখানে অনেক বেশী। দুপুরে ভাত খাওয়ার পর সকলেরই একটু ঘুম-ঘুম লাগছিল। নাগরাজন তার বাঙ্কের ওপর উঠে রীতিমত নিদ্রা শুরু করল। প্রলয় বিজ্ঞান-বিষয়ক কি একটা ম্যাগাজিনের পাতায় মুখ গুঁজে দিল। আম্মা লোয়ার বার্থে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরল। সুশান্ত হাই তুলে একবার চোখ বন্ধ করল। কিন্তু তার ঘুম এল না। অগত্যা জানালার ধারে বসে সে আগের মতো মাঠ-ঘাট, বন-জঙ্গল, গিরি-প্রান্তর দেখতে লাগল।

গাড়ি মাদ্রাজে এসে ঢুকল সন্ধ্যে সাতটায়। এখান থেকে ট্রেন বদল করে কালিকটের গাড়িতে উঠতে হবে। মাত্র আধঘণ্টা ফারাক, —সাড়ে সাতটায় ম্যাঙ্গালোর মেল ছাড়ে। পরদিন সকাল ন'টা নাগাদ কালিকট স্টেশনে পৌঁছয়।

ম্যাঙ্গালোর মেল অত দ্রুতগামী নয়। করমণ্ডল এক্সপ্রেসের মতো গাড়ি অমন ঝকঝকে তকতকে লাগল না। বরং সে তুলনায় বেশ

ময়লা। বসবার গদিতে, বাথরুমের ভিতরে, মুখ ধোবার কলে এবং বেসিনেও তার সুস্পষ্ট চিহ্ন। গাড়ির সিলিঙও যেন বিবর্ণ। মাদ্রাজ ছেড়ে আসবার পর উর্দিপরা একজন বয় গোছের লোক এসে তাদের খাবারের অর্ডার নিয়ে গেল। আরকোনম্ স্টেশনে সেই লোকটা তাদের তিন প্লেট খাবার সার্ভ করল। খাবার মানে এগ-কারি রাইস। বিকল্পে ভেজিটেরিয়ান মিল পাওয়া যায়। আম্মা রাত্তিরে আর কিছু খেতে চাইল না। বলল, 'দশটা-এগারোটার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাব। বাস থেকে নেমেই না হয় কিছু খেয়ে নিলে হবে।'

কালিকট স্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়াল সওয়া ন'টায়। ডিসেম্বর মাস, কিন্তু শীতের বালাই নেই। কম্পার্টমেন্টের ভিতরে বসে বরং গরম লাগছিল। রেলপথের দুপাশে ঘন গাছপালা। পত্রসজ্জার আড়ালে ছোট ছোট গ্রাম। লুঙ্গির মতো করে জড়ানো একখণ্ড বস্ত্র পরে লোকজন পথেঘাটে দিব্যি ঘোরাফেরা করছে। ঊর্ধ্বাঙ্গে শুধু একটা ফতুয়া কিংবা জামা।

প্রলয় সহাস্যে জানাল, 'দক্ষিণ ভারতে সর্বত্র এই বেশ। অফিস-কাছারি, হাট-বাজার এমন কি উৎসব-বাড়ি—সর্বত্র এতেই স্বচ্ছন্দে চলে।'

নাগরাজন বলল, 'কালিকট জেলাশহর। কিন্তু তোমাদের খড়্গপুর কিংবা মেদিনীপুরের চেয়ে অনেক বড়।'

প্রলয় হেসে জবাব দিল, 'আমাদের পশ্চিম বাংলায় তো একটা মাত্র শহর। সেটা আবার মহানগরী, তার নাম কলকাতা। বাকি সব চুনোপুঁটি।'

স্টেশন থেকে বেরিয়ে তারা অটোতে উঠল। বাস-স্ট্যাণ্ড মাইল খানেক দূরে। একটা অটোতে নাগরাজন আর আম্মা। অন্যটিতে সে এবং সুশান্ত। যেতে যেতে উভয়ে লক্ষ্য করল কালিকট শহরটা মোটেই ছোট নয়, বরং বেশ বড়ো। রীতিমত বিলাসবহুল হোটেল, কয়েকটি সুদৃশ্য সিনেমা হল, বহু হাল-ফ্যাশানের বাড়ি,—এক

নজরেই বোঝা যায় এখানকার মানুষজনের হাতে কাঁচা পয়সা আছে।

প্রলয় চাপা গলায় বলল, 'সব গালফ্ মানির জৌলুস, বুঝতে পারলি ?'

গালফ্ মানি কথাটা সুশান্তর ঠিক বোধগম্য হল না। তাই জিজ্ঞাসু চোখে সে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

ব্যাখ্যা করে প্রলয় বলল, 'গালফ্ মানি হল পারস্য এবং ওমান উপসাগরের তীরবর্তী দেশগুলি থেকে পাঠানো টাকা। কেরালার অসংখ্য লোক আরব সমুদ্র পেরিয়ে উপসাগরের দেশগুলিতে কাজ করতে গেছে। তারা যে শুধু লেখাপড়া জানা শিক্ষিত মানুষ তাই নয়। হাতে-কলমে কাজ জানে এমন লোকও সেখানে গিয়ে ভিড় করেছে। এরা কেউ রাজ-মিস্ত্রী, ছুতোর কিংবা প্লাম্বিং'এর দক্ষ কর্মী। এরকম অনেক লোক বাহেরিন, মাসকট, কুয়েত, আবুধাবি অথবা রিয়াদে রয়েছে। কাজের বিনিময়ে তারা মোটা টাকা উপার্জন করে এবং সেই আয়ের একটা সিংহভাগ দেশে অর্থাৎ কেরালায় পাঠায়। এই গালফ্ মানির দৌলতে এখানকার কিছু লোকের হাতে বেশ টাকা পয়সা হয়েছে। সেই টাকা তারা নানা ধরনের ব্যবসায় খাটায়। হোটেল বিজনেস, সিনেমা হল, কেউ বা হাল-ফ্যাশানের বাড়ি তৈরির কাজেও টাকা ঢালছে।

সুশান্ত হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, পর্তুগীজরা তো প্রথম ভারতের মাটিতে পা দিয়েছিল ?'

'হ্যাঁ। ভাস্কো-ডা-গামা তার জাহাজ নিয়ে কালিকটের বন্দরে এসে উঠেছিলেন। সেটা ১৪৯৮ সাল। তখন কালিকটের রাজা জামোরিন।'

সামনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে লাল রঙের সব বাস দাঁড়িয়ে। বিরাট একখানা তিনতলা বাড়ি পিছনে। সম্ভবতঃ ওটা বাস স্টেশনের অফিস। পিছনের অটো থেকে নাগরাজন চেঁচিয়ে বলল, 'ওই দেখ, কাটাঙ্গাল যাবার বাস ডান দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

অটো থেকে চটপট নেমে জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে সকলে কাটাঙ্গাল যাবার বাসের কাছে চলে এল। খোঁজ নিয়ে নাগরাজন জানাল, 'বাস ছাড়তে আরো দশ মিনিট দেরি আছে।'

আম্মা বলল, 'তাহলে তাড়াতাড়ি টিকিট কেটে আন। আমরা গাড়িতে উঠে বসি।'

কলকাতার মতো বাসে অমন গাদাগাদি ঠাসাঠাসি নেই। দু-চারজন বাদে প্রায় সকলেই সীটে বসেছে। ঠিক সময়ে গাড়ি ছাড়ল। কালিকট শহর পিছনে ফেলে বাস মুক্ত প্রকৃতির মধ্য দিয়ে ছুটে চলল। কেরালার মাটি সবুজ বনজঙ্গলে ভরা। মাঝে মাঝে গ্রাম। যেদিকে তাকাও সেদিকে অগুনতি নারিকেল বৃক্ষ। দমকা হাওয়ায় দীর্ঘ পত্রপল্লব সবেগে আন্দোলিত হচ্ছে। বসতির পাশে কোথাও একটানা সুপারি গাছের সারি। কিছু দূর যেতেই ছোট ছোট পাহাড় চোখে পড়ল। নাগরাজন সহর্ষে বলল, 'ওই দেখ কাটাঙ্গালের সেই পাহাড়টা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।'

বাসের কণ্ডাক্টরকে বলা ছিল তারা কাটাঙ্গালে নামবে। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে গাড়ি একটা গ্রামের কাছে এসে দাঁড়াল। পাশেই পোস্টাফিস। পিছনে কয়েকটা দোকান, বাজার-হাটও রয়েছে। নাগরাজন সীট ছেড়ে উঠে প্রায় ঘোষণা করল, 'নাম এবার। কাটাঙ্গালে পৌঁছে গেছি।'

এক নজরে তাকিয়ে গ্রামটিকে বেশ ভালো লাগল। নেহাৎ ছোট নয়,—অনেক বাড়ি-ঘর, পাকা বাড়ি বেশী। দেয়ালে সাঁটা কয়েকটা সিনেমার পোস্টার চোখে পড়ল। নাগরাজন জানাল, এখানে খড়ে-ছাওয়া একটা ছোট হল আছে। বছরে ছ-মাস চলে। বর্ষাকালে বিশেষ করে চাষের সময় আর শো হয় না। এ ছাড়া গ্রামে হাই স্কুল রয়েছে, ছেলে-মেয়ে সব একসঙ্গে পড়ে।

বাসের রাস্তা ছেড়ে একটু ভিতরে গেলেই নাগরাজনদের আবাস। ইটের দেয়াল, তবে টালির ছাউনি। কিন্তু বাড়িটা বেশ বড়,—

অনেকখানি উঠোন। ডিসেম্বর মাসে নানা রঙের ফুল ফুটেছে একধারে। তারা বাড়িতে ঢুকতেই একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলেন। মাথার চুল সব সাদা। বয়স ষাটের কাছাকাছি। তবে এখনও বেশ শক্ত সমর্থ, কাছে এসে সস্নেহে নাগরাজনের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন।

মালয়ালী ভাষায় কি যেন কথাবার্তা হল। তারপর প্রলয় আর সুশান্তর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই আম্মা বলল, 'ওরা তুজনেই নাগরাজনের বন্ধু। আমাদের সঙ্গে কেরালায় বেড়াতে এসেছে।'

নাগরাজন পরিচয় জানাল, 'ইনি আমার ঠাকুমা। এখানেই থাকেন।'

বুড়ি কিন্তু এবার তাদেব তুজনকেই চমকে দিল। পরিষ্কার ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের নাম কি?'

প্রলয় আর সুশান্ত জবাব দিতেই বুড়ি হাসল। কাছে এসে মাথার চুলে তারপর তুজনের গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, 'এখানে বেড়াতে এসেছ শুনে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। আমার বিশ্বাস কয়েকদিনের জন্য কেরালা তোমাদের খুব ভালো লাগবে।'

কোণের দিকে একটা বড় ঘরে আম্মা তাদের থাকবার ব্যবস্থা করল। ঘরে তুটি খাট পাতা, টেবিল-চেয়ার একটা দেয়াল-আলমারিও রয়েছে। ঘরের মধ্যে তুটি বড় জানালা। বাড়ির পিছনে অনেক নারকেল গাছ। নাগরাজন বলছিল তাদের নাকি নারকেল গাছের একটা বাগান আছে। ফি-বছর নারকেল বিক্রি করে যা আয় হয় তাতেই সংসার ভালভাবে চলে যায়।

তুপুরটা এক ঘুমে কাবার। সুশান্তর যখন ঘুম ভাঙল তখন বাড়ির বাইরে নারকেল গাছের পাতায় এক চিলতে রোদ্দুর লেগে রয়েছে। নাগরাজন তাদের তুজনের নাম ধরে ডাকছিল। তখনও প্রলয়ের চোখে ঘুম লেগে। তু-রাত্তির আধঘুমে কেটেছে। তাই মধ্যাহ্ন ভোজের পর বিছানায় শুয়ে পড়তেই গাঢ় নিদ্রা হতে বিলম্ব হয় নি।

ডাকাডাকিতে প্রলয় উঠে বসল। বাইরের অপরাহ্নের দিকে

তাকিয়ে সলজ্জ হেসে বলল, 'ইস! আর একটু ঘুমোলেই তো রাত্তির হয়ে যেত।'

চা খেয়ে তিনজনে বেড়াতে বেরুল। অন্ধকার হতে আর বেশী দেরি নেই। অপরাহ্নের শেষ আলোকে পশ্চিমের আকাশটা অবশ্য এখনও উজ্জ্বল। নাগরাজন বলল, 'এখানে সন্ধ্যে হতে একটু দেরি হয়। সূর্য ডোবার পরেও কিছুক্ষণ আলো থাকে।'

'তেমনি আবার সকাল হতেও সময় নেয়, তাই না?' প্রলয় প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, তাই।' নাগরাজন হেসে জবাব দিল।

প্রলয় বলল, 'আমরা যেখানে আছি সেটা ভারতের পশ্চিম উপকূল। জাপান কিংবা অরুণাচলে যখন সূর্যের আলো এসে পৌঁছয় বোম্বাই এবং ভারতের পশ্চিম উপকূলে তখনও অন্ধকার। তারপর সূর্য আর একটু উপরে উঠলে এখানেও আলো ফোটে।'

হাঁটতে হাঁটতে তারা কখন গ্রামের বাইরে চলে এসেছে খেয়াল করে নি। নাগরাজন হঠাৎ সামনে তাকিয়ে অস্ফুটে বলে উঠল, 'ওই সেই পাহাড়টা।'

প্রলয় এবং সুশান্ত দুজনেই থমকে দাঁড়াল। মুখ তুলে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। হ্যাঁ, সামনে একটা পাহাড়। খুব বেশী দূরে নয়। অনেকটা হাতির মতো দেখতে, আকাশে হেলান দিয়ে যেন সেটা দাঁড়িয়ে আছে।

ধীরে ধীরে অন্ধকার নামছিল। স্পষ্ট নজর হয় না। তবুআবছা আলোতেও পরিষ্কার বোঝা গেল পাহাড়টা ন্যাড়া নয়, বরং ঘন বন-জঙ্গলে ভর্তি।

তখুনি তাদের সকলকে স্তম্ভিত করে সেই আশ্চর্য ব্যাপারটা ঘটল। পাহাড়ের মাথায় দপ করে একটা লাল আলো জ্বলল। বেশ উজ্জ্বল আলো,—বহু দূর থেকে সেটা নজরে পড়বে।

প্রলয়ের মনে হল লাল আলোটা যেন একটা নিষেধের ইঙ্গিত। যতদিন ওটা জ্বলবে, ততদিন ওই নিষেধ বলবৎ রইল।

পাঁচ

সন্ধ্যে হতেই ওরা ফের ঘরমুখো হল।

প্রলয় জিজ্ঞাসা করল, 'পাহাড়ের ওপর দিয়ে ইলেকট্রিকের তার গেছে, তাই না?'

নাগরাজন একটু চিন্তা করে জবাব দিল, 'হ্যাঁ। পাহাড় ডিঙিয়েই তো কাটাঙ্গালে ইলেকট্রিক লাইন এসেছে।'

সুশান্ত বলল—'লাল আলোটা বেশ ব্রাইট, তাই না রে?'

প্রলয় আড়চোখে তার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে উত্তর দিল, 'ওটা মার্কারি ল্যাম্প, তাই অত উজ্জ্বল লাগছে।'

'আচ্ছা, এই লাল বাতিটা তো হঠাৎ একদিন সবুজ বাতি হয়ে যায়—ঠিক কিনা?' মুখ ফিরিয়ে সুশান্ত এবার নাগরাজনের দিকে তাকাল। জবাবটা বোধহয় তার কাছ থেকেই সে আশা করছিল।

কিন্তু নাগরাজন কোনো উত্তর দেবার আগেই প্রলয় মন্তব্য করল, 'আলোটা কতদিন আগে সবুজ হয়েছিল সেটা একবার খোঁজ নিতে হবে, বুঝলি?'

'তার জন্য চিন্তা নেই।' নাগরাজন বলল। 'কাল সকালে আব্রাহাম কাকাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাবে।'

'আব্রাহাম কাকা কে?'

'উনি এখানকার প্রাইমারী স্কুলের টিচার। পুরো নাম জন আব্রাহাম—ক্রীশ্চান। পাহাড়ের মাথায় ওই লাল আলোটা যখন প্রথম জ্বলতে শুরু করে তখন আব্রাহাম কাকাই একদিন পাহাড়ে উঠে আলোটা কেন জ্বলে তার সম্বন্ধে খোঁজ খবর করেছিলেন।'

প্রলয় জিজ্ঞাসা করল, 'আব্রাহাম কাকা থাকেন কোথায়?'

'গ্রামের শেষ প্রান্তে। ব্যাচিলর মানুষ। ঠিক পাদ্রী নন, কিন্তু পাদ্রীর মতো পোশাক। প্রাইমারী স্কুলটা নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত। অবসর সময়ে পড়াশুনো করেন। পৃথিবীর নানা বিষয়ে ওঁর এত জ্ঞান যে একদিন আলাপ করলেই তুই সেটা বুঝতে পারবি।'

'তাহলে চল না, কাল সকালেই একবার আব্রাহাম কাকার কাছ থেকে ঘুরে আসি।' সুশান্তর দিকে তাকিয়ে প্রলয় ফের বলল, 'কি রে, যাবি?'

'নিশ্চয়। অমন একটা মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলে কাটাঙ্গাল এবং তার আশেপাশের মানুষের কথা অনেক জানতে পারবি। তা ছাড়া পাহাড়ের মাথায় ওই লাল আলোটা কেন রোজ জ্বলে তার রহস্য খুঁজে বের করতে উনি হয়তো সাহায্য করতে পারেন।'

বাড়ি ফিরে প্রলয় তার জিনিসপত্র নিয়ে বসল। প্রথমেই রিসিভিং সেটটা বের করল। ইলেকট্রিক কনেকশন করে কি যেন একটা স্টেশন ধরতেই দুর্বোধ্য ভাষায় গানের কলি ভেসে এল।

নাগরাজন বলল, 'মালয়ালী গান নয়। নিশ্চয় অন্য কোনো স্টেশন ধরেছিস?'

প্রলয় একটু চিন্তা করে জবাব দিল, 'এটা বোধহয় ইউরোপের কোনো স্টেশন। তবে কোন দেশ তা বলতে পারব না।'

সুশান্ত বলল, 'তোর এই রিসিভিং সেটে তো ফ্রিকোয়েন্সি মডিউলেটেড ওয়েভ ধরা পড়বে?'

'বারে!' প্রলয় তারিফ করে বলল, 'তুই তো দেখছি ঠিক মনে রেখেছিস? তবে শুধু ফ্রিকোয়েন্সি মডিউলেটেড ওয়েভ নয়, রেডিও স্টেশন থেকে যে অ্যামপ্লিচিউড মডিউলেটেড ওয়েভ কিংবা শর্ট ওয়েভ ছাড়ে আমার রিসিভিং সেটে তাও ধরবার ব্যবস্থা আছে। সাধারণ একটা রেডিও সেটে যা থাকে এও প্রায় তেমনি। তবে আমার সেটটা অনেক বেশী পাওয়ারফুল, এই যা—।'

'আর ফ্রিকোয়েন্সি মডিউলেটেড ওয়েভ? তাও নিশ্চয় সেটে ধরা পড়বে?'

'হ্যাঁ। তবে ওর অ্যারেঞ্জমেন্ট একটু আলাদা। আসলে এটাকে তুই রেডিও-টেলিফোন কিংবা ওয়্যারলেস-টেলিফোন বলতে পারিস। ফরেনে যেমন আমেরিকা, ওয়েস্ট জার্মানীর মতো শিল্পোন্নত দেশে,— বড় বড় ফ্যাক্টরিতে, অফিসে, হাসপাতালে, রেডিও-টেলিফোনে যোগাযোগ হয়ে থাকে। তোদের ইনটারেস্ট থাকলে আমি একটা সার্কিট ড্র করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে পারি।'

'থাম দিকি।' নাগরাজন হেসে বলল, 'ওসব বড় বড় থিয়োরী কি আমাদের ছোট্ট মগজে ঢুকবে?'

সুশান্ত ঠোঁট উল্টিয়ে মন্তব্য করল, 'কি যে সব তত্ত্ব কথা বলিস। আমরা তো কিছুই বুঝতে পারি না।'

প্রলয় মুচকি হেসে জবাব দিল, 'এখন তত্ত্বকথা বলছিস, কিন্তু শেষে হয়তো দেখবি এই রিসিভিং সেট থেকে পাহাড়ের মাথার ওই ওই লাল বাতির রহস্য উদ্ধার হয়ে গেছে।'

ব্যাগের ভিতর থেকে প্রলয় এবার তার বাইনোকুলার আর টেলিস্কোপ যন্ত্রটি বের করল।

সুশান্ত কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'পাহাড়ের ওই আলোর রহস্য খুঁজে বের করতে এগুলো প্রয়োজন হবে নাকি?'

'হ্যাঁ, তা কাজে লাগতে পারে।' প্রলয় টেলিস্কোপটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। কয়েক সেকেণ্ড পরে বলল, 'একটু রাত্তির হোক। তারপর বাইরে গিয়ে তোকে আকাশের অনেক গ্রহ-নক্ষত্র চিনিয়ে দেব।'

'স্যাটার্ণের রিং দেখাবি বলেছিলি।' সুশান্ত যোগ করল।

প্রলয় কোনো জবাব দিল না। টেলিস্কোপের কাচে চোখ লাগিয়ে সে বোধহয় কিছু দেখবার চেষ্টা করছিল। কয়েক সেকেণ্ড পরে জানালার কাছে সরে গিয়ে লক্ষ্য বস্তুকে দেখতে পেয়ে নাগরাজনকে

বলল, 'কাছে এসে দেখ। পাহাড়ের মাথায় লাল আলোটা কেমন স্পষ্ট দেখাচ্ছে।'

প্রথমে নাগরাজন, তারপর সুশান্তও দেখল। প্রলয় বলল, 'পাহাড়ের কাছাকাছি নিশ্চয় কোথাও একটা ট্রান্সফর্মার আছে।'

'ট্রান্সফর্মার?' সুশান্ত ভ্রূ কুঁচকে রইল।

প্রলয় বলল, 'হ্যাঁ। তবে এটা স্টেপ-ডাউন ট্রান্সফর্মার। যার সাহায্যে হাই ভোল্টের কারেন্টকে চার'শ চল্লিশ ভোল্টে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়। তারপর সেখান থেকে ডিসট্রিবিউটিং লাইন দিয়ে বাড়ি বাড়ি বিদ্যুৎ পৌঁছে যায়।'

'তুই ঠিক ধরেছিস তো।' নাগরাজন মুখ উজ্জ্বল করে তাকাল। বলল, 'পাহাড় ডিঙিয়ে খানিকটা গেলে একটা ইলেকট্রিক সাব-স্টেশন আছে।'

'আর ট্রান্সফর্মার?' সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল।

নাগরাজন বলল, 'পাহাড়ের ঠিক গায়ে একটা ট্রান্সফর্মারও রয়েছে।'

'থাকতেই হবে। নইলে ওই বুড়ো লোকটা পাহাড়ের মাথায় বাতি জ্বালানোর জন্যে কারেন্ট কোথায় পাবে?' প্রলয় মন্তব্য করল।

সুশান্ত বলল, 'পাহাড়ের ওপর ইলেকট্রিকের তার গেছে। নিশ্চয় সেখান থেকেই কারেন্ট নিচ্ছে?'

'উহুঁ।' প্রলয় মাথা নাড়ল। বলল, 'হাই ভোল্টের কারেন্ট, যেমন ধর এগারো হাজার ভোল্ট, যাকে আমরা এগারো কেভি বলি, তার দ্বারা তো ইলেকট্রিক বাতি জ্বলবে না। ওই এগারো কেভি কারেন্টকে সাব-স্টেশনে স্টেপ-ডাউন ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে বেশ কিছুটা নামিয়ে আনে। তারপর ডিসট্রিবিউশনের আগে আর একটা ট্রান্সফর্মারে সেটা চার'শ চল্লিশ ভোল্টে এসে দাঁড়ায়। আমার ধারণা লোকটা ওই ডিসট্রিবিউশন লাইন থেকে কারেন্ট চুরি করে পাহাড়ের মাথায় বাতি জ্বালাচ্ছে।'

নাগরাজন ওর বুদ্ধির তারিফ করে বলল,—'সত্যি। তোর মগজে কি আছে আমার ফুটো করে দেখতে ইচ্ছে হয়।'

'দিন-রাত্তির তো ওই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।' সুশান্ত মুচকি হেসে নাগরাজনকে উদ্দেশ্য করে জানাল, 'আমার মা বলে প্রলয় একদিন মস্ত কিছু একটা আবিষ্কার করে দেশসুদ্ধ লোককে তাক লাগিয়ে দেবে।'

একটু পরেই আম্মা সকলকে খেতে ডাকল। টেবিলে তিন বন্ধুর খাবার সাজানো। চেয়ারে বসতেই নাগরাজনের সেই ঠাকুমা পরিষ্কার ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করল, 'বিকেলে তোমরা গিয়েছিলে কোথায়?'

সুশান্ত সরল মনে জবাব দিল, 'আমরা ওই পাহাড়টার দিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম।'

পাহাড়ের কথা শুনে কিচেন রুম থেকে আম্মা বেরিয়ে এল। চিন্তিত মুখে বলল, 'অবেলায় তোমরা আবার ওদিকটায় গেলে কেন?'

সুশান্ত একটু ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'সন্ধ্যের দিকে ওদিকে যাওয়া বারণ বুঝি?'

'না, ঠিক বারণ নয়। তবে পাহাড়ের নিচে কি রকম ঝোপ-জঙ্গল হয়েছে দেখলে তো? কোথায় কি লুকিয়ে আছে তা কেউ বলতে পারে? তা ছাড়া এই সময়টা পাহাড়ে চিতাবাঘের উপদ্রব হয়।'

'চিতাবাঘ?' প্রলয় ভ্রূ কুঁচকে তাকাল।

আম্মা বলল, 'এতে অবাক হওয়ার কি আছে? বনে-জঙ্গলে চিতাবাঘ থাকতেই পারে। সন্ধ্যের অন্ধকার হলে পাহাড় থেকে এক-আধটা ছিটকে আসে। গ্রামে ঢুকে গোরু-বাছুরের উপর হামলা করে।'

'কিন্তু সে তো অনেক বছর আগেকার কথা মা।' নাগরাজন মুখ তুলে তাকাল। বলল, 'এখন শুনেছি আর বাঘের উপদ্রব নেই।'

'কে বললে নেই?' আম্মা যেন পাল্টা প্রশ্ন করল। মৃদু হেসে ফের বলল, 'কথায় আছে, সাপের লেখা আর বাঘের দেখা। কখন যে ঘটে তাই কি কেউ আগে থেকে জানতে পারে?'

নাগরাজনের ঠাকুমা বলল, 'শুধু বাঘের ভয় নেই। ওই পাহাড়টার আরো একটা দুর্নাম আছে।'

'আবার কি দুর্নাম ঠাকুমা ?' নাগরাজন শুধোল।

প্রলয় আর সুশান্তকে লক্ষ্য করে ঠাকুমা ঈষৎ গম্ভীরমুখে বলল, 'এরা তো বাইরে থাকে। গ্রামের ব্যাপার-স্যাপারের অত খোঁজ-খবর রাখে না। নইলে নাগরাজন একথা নিশ্চয় তোমাদের বলত।'

আম্মা বোধহয় কথাটা আগে শুনেছিল। তাই বাধা দিয়ে বলল, 'রাত্তিরবেলা ছেলেমানুষদের কাছে আবার ওসব গল্প কেন মা ? হয়তো ভয়ে ঘুমোতে পারবে না।'

'আমাদের অত ভয় নেই আম্মা।' প্রলয় হেসে জবাব দিল। বলল, 'বরং কথাটা না শুনলে সারা রাত্তির ছটফট করব।'

নাগরাজনের ঠাকুমা বলল, 'তাহলে শোনো। কিছুদিন ধরে ওই পাহাড়টা থেকে একটা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে।'

'কান্নার শব্দ ?' সুশান্ত অস্ফুটে বলল।

'হ্যাঁ। অনেক রাত্তিরে এই ধর দেড়টা-দুটো বাজলে মেয়েমানুষের গলার একটা নাঁকি সুরের কান্না ওই পাহাড়টা থেকে ভেসে আসে।'

'আপনি নিজের কানে শুনেছেন ?' প্রলয় জানতে চাইল।

'হ্যাঁ। এখন বুড়ো হয়েছি তাই চট করে রাত্তিরে ঘুম আসে না। বিছানায় শুয়ে জেগে থাকি। তারপর যা বলছিলাম রাত্তির দেড়টা-দুটো নাগাদ ওই কান্নার শব্দটা আমি বেশ কয়েকবার শুনেছি।'

'প্রতি রাত্তিরেই কি কান্নার শব্দটা পাহাড় থেকে ভেসে আসে ?'

'না।' ঠাকুমা মাথা নাড়ল। ঈষৎ চিন্তা করে বলল, 'তবে সপ্তাহে একদিন কিংবা দু'দিন তো নিশ্চয়। জেগে থাকলে আজ রাত্তিরেও হয়তো সেই কান্নার শব্দ তোমরা শুনতে পাবে।'

প্রলয় জিজ্ঞাসা করল, 'গ্রামের আরো অনেকে নিশ্চয় ওই কান্নার শব্দটা শুনতে পেয়েছে ?'

'হ্যাঁ। তবে বুড়োবুড়িরাই বেশী। আসলে তখন ছেলে-ছোকরা সব ঘুমে অচেতন। অত রাত্তিরে না ঘুমিয়ে কে জেগে থাকবে?'

প্রলয় অনেকক্ষণ চিন্তা করে ফের প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা ঠাকুমা, কান্নার শব্দটা কতক্ষণ শুনতে পেয়েছেন?'

নাগরাজনের ঠাকুমা ভ্রূ কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে জবাব দিল, 'তা দশ-বারো মিনিট তো হবেই। কান্নার শব্দটা প্রথমে একটু জোরে শোনা যায়। তারপর কাঁদতে কাঁদতে যেমন বেগটা কমে তেমনি শব্দটাও ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে।'

সুশান্ত বলল, 'অত রাত্তিরে পাহাড়ে বসে কে কাঁদে ঠাকুমা? পেত্নী নয় তো?'

ভয়ের কথা বলতে গিয়ে মানুষের মুখের চেহারা যেমন বদলে যায় বুড়িকে তেমনি থমথমে দেখাল। ধীরে ধীরে সে বলল, 'পাহাড়ের ওপরে তো আর ঘরবাড়ি নেই যে রাত দুপুরে কোনো মেয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি করে পা ছড়িয়ে কাঁদবে? তাহলেই চিন্তা করে দেখ, কান্নাটা কার হতে পারে? তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কি ঠাকুমা?' নাগরাজন শুধোল।

বুড়ি এক পলক আম্মার মুখের ওপর চোখ রাখল। ফের দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলল, 'তিন-চার বছর আগে কাটাঙ্গালের একটা মেয়ে ছাগল কিংবা গোরু খুঁজতে ওই পাহাড়ে উঠেছিল। তারপর পিছন দিকে খাদের মধ্যে সে হঠাৎ পড়ে যায়। তখন উদ্ধার পাবার জন্য মেয়েটা খুব কান্নাকাটি করে। কিন্তু নির্জন পাহাড়ে অবেলায় কি লোক রয়েছে? তারপর ওই গভীর খাদের নিচে থেকে হয়তো ওকে টেনে তোলা সম্ভব হত না। এখন লোকে বলে রাত নিশুতি হলে সেই মেয়েটা অমনি নাকি সুরে কাঁদে। একবার যদি কেউ নিশির কান্না শুনে ভুল করে পাহাড়ে ওঠে তাহলে নির্ঘাত তাকে পথ ভুলিয়ে খাদের ভিতর টেনে এনে বেঘোরে মেরে ফেলবে।'

প্রায় একটা ভৌতিক পরিবেশ গড়ে উঠছে দেখে আম্মা তাড়াতাড়ি

বলল, 'যারই কান্না হোক, তাই নিয়ে তোমাদের অত ভাবনার কি আছে ? গভীর রাত্তিরে ভূত-পেত্নী পাহাড়ে কাঁদলে আমাদের কি যায় আসে ? তা ছাড়া তোমরা নিশ্চয় সেই পাহাড়ে উঠবে না।'

নাগরাজন কিছু বলতে চাইল। কিন্তু প্রলয় সকলের অলক্ষ্যে তার বাম বাহুতে একটা মৃদু চিমটি কেটে বন্ধুকে নিরস্ত করল। ফিক করে হেসে ফের নিজেই বলল, 'ওসব পাহাড়-পর্বতে আমরা কেন উঠতে যাব আম্মা ? বিকেলবেলা এমনি বেড়াতে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি বারণ করলে, আর সে পথে পা মাড়াব ?'

আম্মাকে খুশী-খুশী দেখাল। এক গাল হেসে বলল, 'জানি বাবা। তোমারা দুজনেই বড়ো ভালো ছেলে। আর সেই ভরসাতেই তো সঙ্গে করে এত দূরে নিয়ে এসেছি। এখন ভালয় ভালয় সকলকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে যেতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।'

সেই বড়ো ঘরটায় তিনজনের শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। দুটি খাট আগেই ঘরে ছিল। নিজের জন্য নাগরাজন একটা ফোল্ডিং কট্ এনে বিছানা পেতে ফেলল।

অপাঙ্গে তার দিকে একবার তাকিয়ে সুশান্ত বলল, 'ওই ছোট খাটটায় ঘুমোতে তোমার অসুবিধে হবে না ?'

'অসুবিধে কিসের ?' নাগরাজন পরিষ্কার জবাব দিল। বলল, 'বিছানায় শুয়ে গল্প শুরু করলে কখন যে দু-চোখের পাতা জড়িয়ে আসবে তা নিজেই টের পাব না।'

মুখ নিচু করে প্রলয় কি যেন ভাবছিল। আড়চোখে নাগরাজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই যা ভাবছিস তা কিন্তু হবে না।'

'তার মানে ?' নাগরাজন ভ্রূ কোঁচকাল।

প্রলয় বলল, 'রাত্তিরটা আমরা পালা করে জেগে কাটাব।'

'কেন ?' সুশান্ত প্রশ্ন করল।

'কেন আবার ?' প্রলয় হেসে জবাব দিল, 'সেই পেত্নীর কান্নাটা স্বকর্ণে শুনতে চাই।'

'পেত্নীর কান্না ?'

'হ্যাঁ। ঠাকুমা তো বললেন রাত্তির দেড়টা-দুটো নাগাদ কান্নার শব্দটা ভেসে আসে। হয়তো আজ রাত্তিরেও শোনা যেতে পারে।'

ঘড়িতে প্রায় দশটা। রাত্রি জাগরণের প্ল্যানটা প্রলয় তাড়াতাড়ি ছকে ফেলল। প্রথম দু-ঘণ্টা সুশান্ত, তারপর বারোটা থেকে রাত্তির দুটো পর্যন্ত প্রলয় নিজে। আর শেষ যামে নাগরাজন জেগে থাকবে।

প্রস্তাব শুনে সুশান্ত বলল, 'পালা করে জেগে থাকার চেয়ে তিনজনে মিলে গল্পগুজব করে রাত্তির দুটো পর্যন্ত কাটিয়ে দিই ? সেই তো ভাল।'

প্রলয় হেসে বলল, 'কেন, একা জেগে থাকতে তোর ভয় করবে ?'

'দূর! ভয় কিসের ? পাহাড় থেকে নেমে পেত্নী তো আর এই ঘরে এসে ঢুকছে না।'

নাগরাজন একটা ঢোক গিলে বলে ফেলল 'তিনজনে মিলে জেগে থাকলেই সুবিধে, বুঝলি ? কথায় আছে, একা না বোকা—'

অগত্যা তাই। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে প্রলয় শুধু জানাল 'দেখিস, রাত্তির বেশী হলে আবার যেন ঘুমিয়ে পড়িস নে।'

'পাগল নাকি ?' সুশান্ত সরব প্রতিবাদ জানাল, 'অবেলায় ঘুমিয়ে উঠেছি। এখন চোখ বুজলেই কি চটপট ঘুম আসবে ?'

প্রলয় বলল, 'ভাবছিলাম টেলিস্কোপটা নিয়ে একবার বাইরে যাব। এখন আকাশ খুব পরিষ্কার। তারাগুলো ঠিক পাথরকুচির মতো জ্বলজ্বল করছে। ডিসেম্বর মাসে ওরায়ন—যাকে আমরা কালপুরুষ বলি, তাকে স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু তোদের যা ভয়, তাতে দরজা ডিঙিয়ে এক পা হাঁটবি বলে মনে হয় না।'

নাগরাজন পাশ ফিরে শুয়েছিল। খোঁচাটা নিঃশব্দে হজম করে সে জবাব দিল, 'আম্মা যদি জানতে পারে যে টেলিস্কোপ নিয়ে এত রাত্তিরে আমরা বাইরে গেছি তাহলে কিন্তু আর আস্ত রাখবে না।'

সুশান্ত হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, পেত্নীর এই ব্যাপারটা কই নাগরাজনের কাছে তো আমরা আগে শুনিনি?'

'ভাল প্রশ্ন করেছিস।' প্রলয় যেন প্রসঙ্গটা লুফে নিল।

নাগরাজন পরিষ্কার জবাব দিল, 'গ্রীষ্মের বন্ধে যখন কাটাঙ্গালে আসি তখন সন্ধ্যেবেলা পাহাড়ের মাথায় ওই লাল বাতিটাকে শুধু জ্বলতে দেখেছি। এখানে নিশুতি রাত্তিরে পেত্নী কাঁদে, এমন কথা কেউ বলে নি।'

প্রলয় তার বক্তব্যকে সাজিয়ে নিল, 'তাহলে ধরে নিতে পারি পেত্নীর এই কান্নাটা তোর গ্রীষ্মের ছুটির পর শোনা গেছে। অর্থাৎ তুই যখন ফের খড়্গপুরে চলে এলি তারপরে—'

'হ্যাঁ, তাই তো মনে হয়।' সুশান্ত মন্তব্য করল।

নাগরাজন বলল, 'কাল সকালে একবার আব্রাহামকাকার কাছে গেলেই সব জানতে পারবি। কাটাঙ্গালের কোনো ব্যাপারই ওঁর নজর এড়িয়ে যায় না। পেত্নীর কান্নাটা কবে থেকে শোনা গেছে উনি ঠিক বলে দেবেন।'

প্রলয় ঈষৎ চাপা গলায় বলল, 'আব্রাহামকাকার কাছে যাচ্ছি, এই কথাটা যেন আম্মার কাছে ফাঁস করিস নে।'

'কেন? তাতে দোষ কিসের?' নাগরাজন পাল্টা শুধোল। বলল, 'আব্রাহাম কাকা তো খুব ভাল লোক। ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি শুনলে আম্মা কিছু মনে করবে না।'

'তোর মগজে যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে', প্রলয় তাকে প্রায় ধমকে উঠল। বলল, 'আব্রাহামকাকার কাছে খোঁজখবর নিয়েই তো আমরা পাহাড়ে উঠব। ধর আম্মা যদি জিজ্ঞাসা করে, কেন তার কাছে গিয়েছিলাম তাহলে কি জবাব দিবি?'

নাগরাজন কোনো উত্তর দিতে পারল না।

সুশান্ত সায় দিল, 'হ্যাঁ, ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলার চেয়ে বরং কথাটা চেপে যাওয়া অনেক ভাল।'

ঘড়িতে টং করে একটা বাজল।

নিঃস্তব্ধ রাত্রি। এই বাড়িটার কোন ঘরে যেন ওয়াল-ক্লক্ আছে। বিছানায় শুয়ে প্রলয় দোলক ঘড়ির ধ্বনি শুনল। নাগরাজন আর সুশান্ত দুজনেই বেশ কিছুক্ষণ ধরে চুপ। নিশ্চয় চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে গেছে। প্রলয়ের একবার ইচ্ছে করল বন্ধুদের নাম ধরে ডাকে। বালিশের পাশেই টর্চ-লাইটটা রেখেছিল। অন্ধকারে হাতড়ে প্রলয় সেটা খুঁজে নিল। সুইচ টিপে আলো ফেলতেই তার সন্দেহের নিরসন হল। সুশান্ত আর নাগরাজন দুজনেই ঘুমে কাদা। বন্ধুদের অবস্থা দেখে প্রলয় মুচকি হাসল। একটু আগে সুশান্তটা কেমন তড়পাচ্ছিল—তিনজনে গল্পগুজব করে রাত্তিরটা জেগে কাটিয়ে দেবে। তবু ভাল। ভাগ্যিস নাগরাজন কিংবা সুশান্তকে রাত্তির জাগতে বলেনি। তাহলে আর দেখতে হত না। আধঘণ্টা বাদে দুজনেই নাক ডাকিয়ে ঘুমোত। আর প্রলয়ের প্ল্যানটা ভেস্তে যেতে বিলম্ব হত না।

জানালার ফাঁক দিয়ে প্রলয় একবার বাইরে তাকাল। অন্ধকার, কিছুই নজর হয় না। বাড়িটার চারপাশে নারকেল গাছ। তবে শুধু নাগরাজনদের বাড়ির পাশেই নয়, এখানকার সর্বত্র নারকেল গাছের ছড়াছড়ি। শুকনো নারকেল যাকে আমরা কোপরা বলি তা কেরালা থেকে ভারতবর্ষের সর্বত্র এমন কি বিদেশেও চালান যাচ্ছে।

পাহাড়ের মাথায় যে লাল আলোটা জ্বলে সেটা বহুক্ষণ নিভে গেছে। প্রলয়ের মনে হল আম্মা যখন তাদের খেতে ডাকল তখন ওটা আর দেখতে পায় নি। এর অর্থ এই যে, লাল আলোটা সন্ধ্যের পর ঘণ্টা দুই থাকে। তারপর কেউ সুইচ অফ করে সেটা নিভিয়ে দেয়।

অন্ধকারে কতক্ষণ চুপ করে শুয়েছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা কান্নার সুর বাতাসে ভেসে আসতেই প্রলয় সজাগ হল। শব্দটা আর একটু স্পষ্ট হতে সে উঠে বসল। ঠাকুমা তাহলে ঠিকই বলেছে। রাত্তির দেড়টা-দুটো বাজলে পাহাড়ের বুক থেকে কান্নাটা ভেসে

আসে। হপ্তায় একদিন কিংবা দু'দিন। কপাল ভালো, কাটাঙ্গালে এসে প্রথম দিনেই কান্নাটা সে স্বকর্ণে শুনতে পেয়েছে।

কিছুক্ষণ বেশ অস্বস্তি, তারপর সামান্য ভয়-ভয় করতে লাগল। প্রলয়ের একবার মনে হল নাগরাজন আর সুশান্তকে ডাকে। তারপর ওই চিন্তাকে সে আদৌ আমল দিল না। ঘুম থেকে উঠে সুশান্ত পরে তাকে খোঁচা দিয়ে বলবে, 'পেত্নীর কান্না শুনে ভয় পেয়ে আমাদের ডেকে তুলেছিস।'

কান্নার শব্দটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল। মনে হল বহু দূরে কেউ যেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বিছানা ছেড়ে প্রলয় এবার উঠে দাঁড়াল। পা টিপে টিপে জানালার কাছে এসে কান পাতল। হ্যাঁ, কান্নাটা যেন বহু দূর থেকে বাতাসে ভেসে আসছে। হয়তো তার মতো কাটাঙ্গালের আরো অনেকে রাত্তির জেগে ওই কান্না শুনতে পায়।

কিন্তু কার ওই কান্না? বহুদিন আগে পাহাড়ের খাদে পড়ে যে মেয়েটি প্রাণ হারিয়েছিল এ কি সেই প্রেতিনীর কণ্ঠস্বর?·····

কিংবা অন্য কারো?······

ছয়

আব্রাহামকে পাওয়া গেল প্রাইমারী স্কুলে। অফিসঘরে বসে তাঁর স্কুলের হিসেবপত্র দেখছিলেন। লম্বা মানুষটি। পরনে সাদা পাতলুন, ঊর্ধাঙ্গে মিশনারী পাদ্রীর মতো ঢিলে জামা। নাগরাজনকে দেখে আব্রাহাম সহাস্যে বললেন,—'আরে তুমি কবে এলে?'

'গতকাল।' নাগরাজন ঠোঁট টিপে হাসল।

তার সঙ্গী দুজনের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে আব্রাহাম ফের জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরা কে?'

ঈষৎ হেসে নাগরাজন জবাব দিল, 'এর নাম প্রলয়। খড়্গাপুর স্কুলে আমার সঙ্গে পড়ে। আর ও হল সুশান্ত। প্রলয়ের কাজিন ব্রাদার, কলকাতায় থাকে।'

'গ্ল্যাড টু মিট ইউ।' আব্রাহাম মিষ্টি হেসে দুজনকে আপ্যায়িত করে বললেন, 'কেরালায় বেড়াতে এসেছে?'

জবাবে সুশান্ত ঈষৎ হাসল।

প্রলয় সামনের চেয়ারে মুখোমুখী বসে আসল কথাটা পাড়ল। বলল, 'আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল আঙ্কল।'

হিসেবের মোটা খাতাটা একপাশে সরিয়ে রেখে আব্রাহাম তার মুখের দিকে তাকালেন। ভ্রূ কুঁচকে কি প্রয়োজন তাই জানতে উৎসুক হলেন।

ঘর ফাঁকা। ওদিকের ক্লাসঘরে পুরোদমে পড়াশুনো চলছে। এদিকটায় এখন কারো আসবার সম্ভাবনা কম। প্রলয় আর ভণিতা না করে সোজাসুজি বলল, 'কাটাঙ্গালের পশ্চিমে ওই যে পাহাড়টা, রোজ সন্ধ্যেবেলা তার মাথায় একটা লাল আলো জ্বলে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এই ব্যাপারে তোমরা কি জানতে চাও?' আব্রাহাম একটু অবাক হলেন।

নাগরাজন পিছনে দাঁড়িয়েছিল। এক পা এগিয়ে এসে বলল, 'আঙ্কল, প্রলয়ের বিশ্বাস ওই লাল আলোর পিছনে একটা মস্ত রহস্য লুকিয়ে আছে।'

আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল আঙ্কল। [পৃঃ ৬৯]

মাথার চুলে হাত বুলিয়ে প্রলয় নিজেই বলল, 'শুধু যে লাল আলো জ্বলে তাই নয়। মাঝে মাঝে ওটা আবার সবুজ হয়। তা ছাড়া সপ্তাহে একদিন কিংবা দু'দিন গভীর রাত্তিরে একটি মেয়ের কান্না শোনা যায়। ওই পাহাড়ের ওপর থেকে সেই কান্নার শব্দটা ভেসে আসে।'

সব শুনে আব্রাহাম ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তোমরা তো দেখছি অনেক খবর জোগাড় করেছ।'

প্রলয় হেসে জানাল, 'লাল আলোটা যে সবুজ হয় সে কথা নাগরাজন বলেছে।'

'আর ওই কান্নার ব্যাপারটা ?'

'ওটা কাটাঙ্গালে এসে ঠাকুমার কাছে জানতে পেরেছি।'

'কান্নাটা তুমি নিজে শুনেছ ?'

'হ্যাঁ।' আড়চোখে বন্ধুদের মুখের ওপর দ্রুত নজর বুলিয়ে প্রলয় জবাব দিল। ঈষৎ চিন্তিত মুখে বলল, 'গতকাল রাত্তিরেই শুনতে পেলাম। তখন দেড়টা কিংবা দুটো হবে। হঠাৎ মনে হল দূরে কোথায় যেন একটা মেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।'

সুশান্ত আর নাগরাজন প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, 'আমাদে তখন ডেকে তুললি না কেন ?'

প্রলয় মিষ্টি হাসল। বলল, 'জেগে থাকব বলে তোরা তো দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোলি। তাই ভাবলাম মিছিমিছি তোদের ঘুমের ব্যাঘাত করি কেন ?'

আব্রাহাম ভ্রূ কুঁচকে তার মুখের দিকে তাকালেন। ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমাকে খুব ইনটেলিজেন্ট মনে হচ্ছে। অন্ততঃ চোখ দুটো তাই বলে। এক মুহূর্ত থামলেন আব্রাহাম। বোধহয় নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে চাইলেন। ঈষৎ গম্ভীর গলায় জানালেন, 'নাউ আই অ্যাম প্রিপেয়ার্ড। হ্যাঁ, কি যেন প্রশ্ন করবে তোমরা ?'

প্রলয় আর দেরি করল না। ঠিক পরীক্ষকের মতো ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল, 'পাহাড়ের মাথায় ওই লাল আলোটা কবে থেকে জ্বলছে ?'

'তারিখটা মনে নেই। তবে এপ্রিল মাসের শেষাশেষি নিশ্চয়।'

'ওই আলোটা জ্বলবার কিছুদিন পরে আপনি নাকি পাহাড়ে উঠে খোঁজ খবর নিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত লাগল। পাহাড়ের চূড়ায় হঠাৎ একটা লাল আলো জ্বলে উঠল কেন ? অবশ্য অ্যাভিয়েশন আইনে

বড় শহরে উঁচু বিলডিং কিংবা ব্রিজের মাথায় রাত্তিরে লাল আলো জ্বালিয়ে রাখবার নির্দেশ আছে। যাতে অন্ধকারে বিমানের হঠাৎ না ধাক্কা লাগে। কিন্তু পাহাড়ের চূড়ায় লাল আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয় এমন কথা কই আগে শুনিনি। বিশেষ করে কাটাঙ্গালের মতো একটা গ্রামের পাশে ছোট পাহাড়ে সেটা জ্বলবে কেন ?'

'ঘটনাটি জানবার জন্যে আপনার খুব কৌতূহল হল, তাই না আঙ্কল ?'

'ঠিক তাই।' আব্রাহাম মৃদু হাসলেন। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ফের বললেন, 'একদিন খুব সকালে কাউকে কিছু না জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। অবশ্য ইতিমধ্যে দু-একজনের মুখে খবর পেয়েছি। পাহাড়ের চূড়ায় কাঠের ঘর বানিয়ে একটা অদ্ভুত প্রকৃতির লোক সেখানে বাস করছে।'

'ওপরে উঠে আপনি কি তার দেখা পেলেন ?'

'হ্যাঁ। ঘরের দরজার সামনে বসে ইলেকট্রিকের তার নিয়ে সে নাড়াচাড়া করছিল।'

'লোকটা কে, কাঠের ঘর বানিয়ে কেন সেখানে বাস করে আপনি নিশ্চয় তা জানতে চাইলেন ?'

'হ্যাঁ, দেখা হবার পর কথাটা তাকে জিজ্ঞাসা করেছি। কিন্তু আমার প্রশ্ন শুনে লোকটা কেমন খিঁচিয়ে উঠল।' আব্রাহাম এক মুহূর্ত থামলেন। ফের নিজেই বললেন, 'মনে হল তার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কারো কাছে জবাবদিহি করতে সে রাজি নয়।'

'লোকটা দেখতে কেমন ?'

'একটু পাগলাটে ধরনের। এক মাথা উস্কো-খুস্কো চুল। বছর পঞ্চাশ বয়স হবে, মুখে দাড়ি।'

আব্রাহাম চোখ ঘুরিয়ে তিন বন্ধুকে ফের নিরীক্ষণ করলেন। ভ্রূ কুঁচকে ঈষৎ চিন্তিতমুখে বললেন, 'কিন্তু ওর হাবভাব, চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করে আমার কি মনে হল জানো ? লোকটা মোটেই অশিক্ষিত নয়। সম্ভবতঃ অনেক বিষয়ে ওর রীতিমত জ্ঞান আছে।'

'আচ্ছা, ওর কাঠের ঘরের মধ্যে আপনি তেমন কিছু দেখতে পেলেন?' প্রলয় প্রশ্ন করল।

'ঘরের মধ্যে আমাকে সে ঢুকতে দেয় নি। বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে একটা বড়ো কাঠের বাক্স দেখেছি। ভিতরে কি ছিল বলতে পারব না।'

'আর কিছু মনে পড়ে?'

আব্রাহাম কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চিন্তায় ডুব দিলেন। ফের চোখ খুলে মুখখানি ঈষৎ উজ্জ্বল করে বললেন, 'হ্যাঁ, ঘরের মধ্যে আমি যেন কিছু বই আর বড়ো একটা ব্যাটারি দেখলাম।'

'ব্যাটারি মানে মোটর গাড়ির ব্যাটারি নিশ্চয়? যাকে আমরা স্টোরেজ সেল বা অ্যাকুমুলেটর বলি।' প্রলয় জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

আব্রাহামের যেন এবার সব মনে পড়ল। ঠোঁট টিপে বেশ প্রত্যয়ের ভঙ্গিতে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ব্যাটারিটা ঘরের এক কোণে বসানো ছিল। প্লাগের সঙ্গে তার জড়ানো রয়েছে দেখলাম। মনে হল ব্যাটারির সঙ্গে ইলেকট্রিক লাইনের একটা কনেকশন আছে।'

মাথার চুলে হাত বুলিয়ে প্রলয় গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করল। ঈষৎ ভেবে বলল, 'আমি এরকম কিছু একটা সন্দেহ করেছিলাম।'

নাগরাজন হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা আঙ্কল, পাহাড় থেকে নেমে আপনি তো থানায় একটা কমপ্লেন করেছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, লোকটাকে দেখে আমার কেমন সন্দেহজনক মনে হল। তা ছাড়া ওর দুর্ব্যবহারেও বেশ বিরক্ত হয়েছিলাম। তাই পরদিন সকালে নিজে থানায় গিয়ে এই ঘটনার একটা তদন্ত করবার আবেদন জানিয়ে এলাম। অন্ততঃ লোকটা কে, কি উদ্দেশ্যে ওই পাহাড়ের চূড়ায় ডেরা বেঁধে বাস করছে, পুলিস সেটা খোঁজ নিয়ে দেখবে।'

'থানা কি এখানেই, মানে কাটাঙ্গালে?'

'না।' আব্রাহাম মাথা নাড়লেন। বললেন, 'থানা থেকে পুলিস গিয়ে লোকটার খোঁজখবর নিয়ে এল?'

'হাঁ, তবে পুলিস বলতে দুজন কনস্টেবল। গ্রামের চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে ওরা পাহাড়ে উঠল। লোকটার জিনিসপত্র নাকি তল্লাসী করেছিল। কিন্তু আপত্তিকর কিছু পায় নি।'

প্রলয় মনোযোগ দিয়ে শুনছিল।

আব্রাহাম কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইলেন। হঠাৎ কি মনে হতে বললেন, 'তারপর কিন্তু একটা ব্যাপার ঘটেছিল।'

'কি ব্যাপার আঙ্কল?' প্রলয় জিজ্ঞাসু হল।

আব্রাহাম বললেন, 'এই ঘটনার দিন দশ পরে আমি একটা চিঠি পেলাম।'

'চিঠি? কে লিখেছিল?'

'কেমন করে বলব? পত্রলেখকের নাম তো ছিল না। তবে চিঠিখানা আমি যত্ন করে তুলে রেখেছি।'

'আপনার আপত্তি না থাকলে সেটা একবার দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়।' আব্রাহাম উঠে দাঁড়ালেন। ড্রয়ার টেনে চিঠিটা বের করে প্রলয়ের হাতে দিয়ে নিজেই মন্তব্য করলেন, 'এটাকে ঠিক চিঠি বলা যায় না। বরং শাসানি বলতে পার।'

'শাসানি?' নাগরাজন অবাক হয়ে শুধোল।

'তা ছাড়া আবার কি?'

কাগজটায় দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে প্রলয় টেবিলে ছোট্ট একটা টোকা মারল। নিচের ঠোঁটটা ঈষৎ কামড়ে মন্তব্য করল, 'শাসানিটা হল ওই লাল আলোর রক্ত চক্ষু।'

সুশান্ত ব্যস্তভাবে বলল, 'আহা! চিঠিখানায় কি লেখা আছে সেটা তো আগে পড়ে শোনাবি।'

প্রলয় মৃদু হেসে জবাব দিল, 'চিঠি কোথায়? এ তো শুধু দু-লাইন ইংরাজীতে লেখা। যার মানে হল, নিজের চরকায় তেল দাও। অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে এলে নাসিকাটি কাটা যাবে। সুতরাং সাবধান!'

আব্রাহাম বললেন, 'ভেবে দেখলাম নিজেকে ঝামেলায় জড়িয়ে লাভ নেই। পাহাড়ের মাথায় একটা লাল আলো জ্বললে আমার কি যায় আসে? আর ওই পাগলাটে ধরনের লোকটা যদি পাহাড়ের চূড়ায় কাঠের ঘর বানিয়ে বাস করে তাতেই বা কার কি ক্ষতি হচ্ছে?'

'কিন্তু ওই পেত্নীর কান্না?' সুশান্ত কথাটা স্রেফ ভয়ে ভয়ে জানাল।

আব্রাহাম গম্ভীর মুখে বললেন, 'নাঁকি সুরে ওই কান্নার শব্দটা লাল আলো জ্বলবার মাসখানেক বাদে শুনতে পেলাম। প্রথমে পর পর কয়েক রাত্তির—তখন কাটাঙ্গালের লোকেরা তো বেশ ভয় পেয়েছিল। তারপর হপ্তায় দু-বার কিংবা তিনবার ওই পেত্নীর কান্নাটা রাত্তির দেড়টা-দুটো নাগাদ বাতাসে ভেসে আসে।'

প্রলয় বলল, 'আঙ্কল, এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন পাহাড়ের মাথায় ওই লাল আলোটার পিছনে একটা গভির রহস্য রয়েছে।'

'তাই তো মনে হয়।' আব্রাহাম বিড় বিড় করলেন। ফের মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু আমি ভাবছি তোমরা তিনজনে মিলে কেমন করে এই রহস্যের কিনারা করবে?'

নাগরাজন বলল, 'আঙ্কল, কাল সকালে আমরা ওই পাহাড়ে উঠব ঠিক করেছি।'

'পাহাড়ে উঠবে?' আব্রাহাম যেন একটু অবাক হলেন।

'তা ছাড়া উপায় কি?' প্রলয় জবাব দিল, 'ওই লাল আলোর রহস্য জানতে হলে পাহাড়ে উঠতেই হবে।'

আব্রাহাম বললেন, 'কিন্তু এ কাজে তো বিপদের ঝুঁকি আছে। তোমরা নেহাৎ ছেলেমানুষ।'

প্রলয় হাসল। বলল, 'বিপদের ঝুঁকি আছে জেনেই তো আমরা নাগরাজনের সঙ্গে কাটাঙ্গালে এসেছি।'

'তোমরা তাহলে প্রস্তুত?'

'ইয়েস আঙ্কল।' প্রলয় গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানাল। 'আমার ধারণা ওই লাল আলোর আড়ালে একটা দুষ্টচক্র মস্ত এক জাল বিছিয়ে রেখেছে। পুলিসে খবর দিয়েছিলেন বলেই ওরা চিরকুটে দু-ছত্র লিখে আপনাকে শাসাতে ভয় পায় নি।'

আব্রাহাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'নাগরাজন, তুমি পাহাড়ে ওঠার রাস্তা জান?'

নাগরাজন ঘাড় চুলকে এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করল। ফের মৃদুস্বরে বলল, 'সে ঠিক খুঁজে নেব আঙ্কল।'

কিন্তু আব্রাহাম সন্তুষ্ট হলেন না। ধীরে ধীরে বললেন, 'পাহাড়ে ওঠার দুটো রাস্তা আছে। একটা দক্ষিণ দিকে আর একটা পুব দিক থেকে কিছুটা খাড়াই ওপরে উঠে গেছে। এদিকটায় জঙ্গল বেশী। দক্ষিণদিকের রাস্তাটা বরং ভাল, কষ্ট কম। তবে পুব দিকের রাস্তাটা ধরলে অল্প সময়ে চূড়ায় পৌঁছান যায়। যারা কাঠ কুড়োতে পাহাড়ে ওঠে তারা এই পুব দিকের রাস্তাটা ধরে।'

প্রলয় জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, পাহাড়ে এখন কোনো জন্তু-জানোয়ারের উপদ্রব আছে?'

'না' আব্রাহাম মাথা নাড়লেন। বললেন, 'কই তেমন খবর তো শুনিনি।'

'আম্মা বলছিল এসময় নাকি পাহাড়ে চিতাবাঘের উপদ্রব হয়?' সুশান্ত প্রশ্ন করল।

আব্রাহাম ঈষৎ হেসে বললেন, 'কেরালার বনে-জঙ্গলে হাতি-বাঘ আর প্রচুর হরিণ মেলে। একসময় কাটাঙ্গালের পিছনের ওই পাহাড়েও চিতাবাঘের উপদ্রব ছিল। বিশেষ করে নভেম্বর মাসে। তবে এখন জঙ্গল ফাঁকা, তাই জন্তু-জানোয়ারের উপদ্রব কম, নেই বললেও চলে।'

সুশান্ত ফের জিজ্ঞাসা করল, 'সাপ-খোপ নিশ্চয় আছে?'

'হ্যাঁ।' আব্রাহাম চটপট জবাব দিলেন। 'পাহাড়ে বড় জাতের

পাইথন আছে। এই তো গত মাসে একটা ছাগলের বাচ্চাকে আস্ত গিলে ফেলেছিল।'

'পাইথন?' প্রলয় ভ্রূ কোঁচকাল।

'হ্যাঁ। মালয়ালী ভাষায় ওকে আমরা মালাপাম্ব বলি। পাম্ব শব্দের অর্থ বড় সাপ।'

'পাহাড়ে বিষাক্ত সাপও আছে?' সুশান্ত ফের প্রশ্ন করল।

'আছে বলেই জানি।' আব্রাহম জবাব দিলেন। এক মুহূর্ত থেমে বললেন, 'জঙ্গলে বিষাক্ত মুর্খন দেখা গেছে।'

'মুর্খন?' প্রলয় জিজ্ঞাসু হল।

আব্রাহাম বললেন, 'মুর্খন মালয়ালী নাম। ইংরাজীতে যাকে তোমরা কোবরা বল।'

'ওরে বাবা!' সুশান্ত সভয়ে তাকাল। 'তার মানে গোখুরো সাপ?'

আব্রাহাম বললেন, 'মুর্খন বিষাক্ত। গত বছর এক শক্ত সমর্থ জোয়ান কাঠ কাটতে পাহাড়ে উঠেছিল। অসাবধানে হয়তো লেজে পা দিয়ে থাকবে। তখুনি মুর্খন ওকে ছোবল মারে। তারপর পাঁচ মিনিট পেরোয় নি। মুখে গ্যাঁজলা ভেঙে লোকটা পাহাড়েই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।'

'কি সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড!' সুশান্ত চোখ দুটি প্রায় কপালে তুলল।

প্রলয় বলল, 'আঙ্কল, পাহাড়ে ওঠার জন্যে আপনি কি একজন গাইড দিতে পারবেন?'

'তা হয়তো পারি।' আব্রাহাম ঘণ্টা বাজিয়ে কাকে যেন ডাকলেন। কালো ছিপছিপে চেহারার একজন লোক এসে সামনে দাঁড়াল। পরনে লুঙ্গির ঢঙে কাপড় ভাঁজ করে পরা। গায়ে জামা। বয়স তিরিশ-বত্রিশ হবে, চোখ দুটি বেশ উজ্জ্বল।

আব্রাহাম মালয়ালী ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'অ্যান্টনি, কাল সকালে তোমার কোনো কাজ আছে?'

লোকটি মাথা নেড়ে বলল, 'ইল্লা অর্থাৎ না।'

'তাহলে কাল এই ছেলেদের নিয়ে একবার পাহাড়ে উঠতে পারবে?'

ঈষৎ হেসে সে জবাব দিল, 'উণ্ডু অর্থাৎ হ্যাঁ।'

প্রলয়কে উদ্দেশ্য করে আব্রাহাম বললেন, 'তাহলে সকাল সাতটা নাগাদ অ্যান্টনীকে নাগরাজনদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেখান থেকেই তোমরা প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়বে।'

'নো আঙ্কল।' নাগরাজন তাড়াতাড়ি বলল, 'আমরা পাহাড়ে উঠতে যাচ্ছি শুনলে আম্মা নির্ঘাত কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে ছাড়বে।'

'বাট হোয়াই? কারণ কি?'

প্রলয় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'কারণ আমরা কোনো অ্যাডভেঞ্চারে বের হই আম্মার সেটা আদৌ ইচ্ছে নয়। তার খালি ভয় হঠাৎ যদি কোনো বিপদ-আপদ ঘটে যায়।'

নাগরাজন বলল, 'আসলে এদের নিয়েই আম্মার যত চিন্তা। এখানে দশ-বারো দিন কাটিয়ে ভালোয় ভালোয় খড়্গপুরে ফিরে যেতে পারলেই মা বোধহয় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে।'

আব্রাহাম হেসে বললেন, 'তোমার আম্মার নিশ্চয় চিন্তা হতে পারে। ছেলে দুটোকে সঙ্গে করে কেরালায় নিয়ে এসেছেন। এখন তাদের বাড়ি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব তাঁর।'

সুশান্ত মুচকি হেসে বলল, 'কিন্তু প্রলয় তো একটা অ্যাডভেঞ্চারের প্ল্যান করেই কাটাঙ্গালে এসেছে। ওই লাল আলোর রহস্য না ভেদ করে সে কিছুতেই খড়্গপুরে ফিরবে না।'

প্রলয় বলল, 'আঙ্কল, কাল সকাল সাতটার মধ্যে আমরা বরং এখানে আসি। অ্যান্টনিকে সঙ্গে নিয়ে পর্বত অভিযান শুরু করি।'

'আম্মাকে বললেই হবে আমরা একটু কালিকট থেকে বেড়িয়ে আসছি।' নাগরাজন যোগ করল।

আব্রাহাম বললেন, 'নট্ এ ব্যাড আইডিয়া। আর এ ছাড়া যখন অন্য উপায় নেই। তবে পাহাড়ে উঠতে কোনো বিপদ আছে

বলে আমার মনে হয় না। অবশ্য ওই লোকটা যদি কোনো ঝামেলা বাধিয়ে বসে, সেটা আলাদা কথা।'

প্রলয় জিজ্ঞাসা করল, 'পাহাড়ে উঠতে কত সময় লাগতে পারে?'

'বড়জোর দেড় ঘণ্টা—তার বেশী নয়। আর সঙ্গে তো অ্যান্টনি থাকছে। ও ঠিক রাস্তায় তোমাদের চূড়ায় পৌঁছে দেবে।'

'তাহলে দুপুর বারোটা-একটা নাগাদ আমরা বোধহয় নেমে আসতে পারব।' সুশান্ত বলল।

'স্বচ্ছন্দে।' আব্রাহাম মৃদু হাসলেন। ফের বললেন, 'পাহাড়ের মাথায় খানিকটা সমতল জায়গা আছে। ওখান থেকে চারপাশের দৃশ্য খুব সুন্দর লাগে।'

নাগরাজন বলল, 'পাহাড়ের ওপর থেকে আরব সাগর তো দেখা যায়।'

'তাই নাকি?' প্রলয় ঘাড় ফেরাল। জিজ্ঞাসা করল, 'আঙ্কল, অ্যারাবিয়ান সী এখান থেকে কত দূরে?'

'মাইল পাঁচ হবে।' আব্রাহাম উত্তর দিলেন। হঠাৎ বললেন, 'কেরালার দুটো বড় নদীর নাম জান?'

'পম্পা আর পেরিয়ার।' নাগরাজন চট্‌পট জবাব দিল।

'ভেরি গুড্।' আব্রাহাম ওর স্মরণশক্তির প্রশংসা করলেন। প্রলয়কে বললেন 'পাহাড়ের ওপর থেকে পম্পার একটা শাখা নদী তুমি দেখতে পাবে। মনে হবে ঠিক যেন একটা রূপোলী পাড় এঁকেবেঁকে কোথায় চলে গেছে।'

সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কেরালার সব থেকে উঁচু পাহাড় কোন্‌টা?'

'আনাই মুদি।' আব্রাহাম ঈষৎ হেসে নাগরাজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আনাইমুদি মানে কি হয়, এদের বুঝিয়ে দাও।'

'আনাই কথার অর্থ হাতি।' নাগরাজন ব্যাখ্যা করল, 'আর মুদি মানে শৃঙ্গ বা পিক।'

'তাহলেই বুঝতে পারছ আনাইমুদি হল হাতির মতো সব থেকে উঁচু পাহাড়।' কথা ফুরোতেই মধুর ভঙ্গিমায় আব্রাহাম শিশুর মতো হেসে উঠলেন।

প্রলয় বলল, 'আঙ্কল, তাহলে এখন আমরা আসি। কাল সকাল সাতটায় ফের দেখা হবে।'

'ও কে।' আব্রাহাম উঠে দাঁড়ালেন। পাদ্রীর মতো ঢিলে বেশবাস। হাত তুলে বিদায়ের ভঙ্গিতে বললেন, 'তোমাদের অভিযান সফল হোক। উইস ইউ অল সাকসেস।'

সাত

পাহাড়টার পাদদেশে পৌঁছে প্রলয় একবার ঘাড় তুলে তাকাল। দেড়-হাজার ফুট নিশ্চয় উঁচু হবে। তাহলে আঙ্কল যা বলেছে তাই ঠিক। চূড়ায় উঠতে ঘণ্টা দেড় সময় লাগবে। রাস্তাঘাট অচেনা। পাহাড়ে উঠতে তারা পটু নয়। নইলে হয়তো অনেক কম সময়ে মাথায় পৌঁছে যেত।

পাহাড়ের গায়ে ঘন জঙ্গল। জন্তু-জানোয়ার, সাপ-খোপ স্বচ্ছন্দে লুকিয়ে থাকতে পারে। তিনজনের পরনে হাফ-প্যাণ্ট, গায়ে হাফ-সার্ট। পায়ে স্কেটস্ জুতো। প্রলয়ের কাঁধে একটা ছোট ব্যাগ। তার ভিতরে খানিকটা শক্ত দড়ি। একটা আট ইঞ্চি মাপের বড়ো ছুরি, স্ক্রু-ড্রাইভার, প্লাস, টুকিটাকি ইলেকট্রিকের কিছু সরঞ্জাম। নাগরাজনের হাতে একটা শক্ত লাঠি। সুশান্তর কাছে ফ্লাস্ক-ভর্তি জল, তার পকেটে একটা রেফারির হুইসিল। হাতে ছোট্ট প্যাকেট, ওর মধ্যে তুলো, শিশিতে খানিকটা আয়োডিন আর লিউকোপ্লাস্ট রয়েছে।

অ্যাণ্টনি গাইড, তাই সে আগে চলেছে। তার পিছনে নাগরাজন আর সুশান্ত। প্রলয় সকলের শেষে। আঙ্কলের নির্দেশমত তারা পুব দিকের রাস্তা ছেড়ে দক্ষিণ দিকের পথ ধরল। সংকীর্ণ পাহাড়ী রাস্তা। দুপাশে গাছপালা, কোথাও ঘন বন। পিছন থেকে প্রলয় জিজ্ঞাসা করল, 'অ্যাণ্টনি, এ তো দেখছি বেশ জঙ্গল।'

লোকটা ইংরাজী বোঝে, কাজ চালানো গোছের ছুটো কথা বলতেও পারে। মুখ ফিরিয়ে সে জবাব দিল, 'পুব দিকের রাস্তাটা ধরলে দেখতে কি রকম ঝোপঝাড় আর বন।'

ধীরে ধীরে তারা ওপরে উঠছিল। জনহীন নির্জন পথ। শুধু কুক্ কুক্ পাখির ডাক। গাছপালার ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ রোদ্দুর তাদের গায়ে এসে পড়েছে। প্রলয় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল প্রায় আটটা বাজে। অ্যাণ্টনি বেশ দ্রুত হাঁটছে। আসলে পাহাড়ী পথে ওঠানামা করতে সে অভ্যস্ত। নাগরাজনও কম যায় না। লম্বা পা ফেলে টক্‌টক্ করে সে দিব্যি এগিয়ে চলেছে। অসুবিধে প্রলয় আর সুশান্তর। কোনোদিন পাহাড়ে চড়া শেখেনি। তবু পায়ে স্কেটস্ জুতো বলে কোনোরকমে হাঁটছে। পাহাড়ী পথ, দুপাশে এক জাতের কাঁটা গাছ। কোথাও রাস্তার মাঝখানে কণ্টকাকীর্ণ ডালপালা ছড়ানো। সাবধানে তা ডিঙোতে হয়, নইলে ক্ষতবিক্ষত হবার সম্ভাবনা।

প্রায় আধঘণ্টা পরে অ্যাণ্টনি এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল। বাঁ দিকে মাঝারি উচ্চতার বেশ শক্ত একটা গাছ। তার ডাল থেকে ডাইনিং টেবিলের গোল পায়ার মতো মোটা কি যেন ঝুলছে। সেদিকে তাকিয়ে নাগরাজন প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'মালা পাম্ব!'

সুশান্ত বিস্ময়ে থ। অস্ফুটে তার মুখ দিয়ে বের হল—অজগর।

অ্যাণ্টনি একদৃষ্টিতে সাপটাকে লক্ষ্য করছিল। তার লেজের দিকের খানিকটা অংশ গাছের ডাল থেকে নিচে ঝুলছে। দেহের বাকিটা বৃক্ষশাখা আশ্রয় করে রয়েছে।

প্রলয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে অ্যাণ্টনি ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে বলল, 'সাপটা বোধহয় একটা পাখি-টাখি গিলেছে। তাই নড়াচড়া নেই। যতক্ষণ না খাদ্যবস্তু ঠিকমত হজম করতে পারবে ততক্ষণ গাছের ডালে অমনি নিঃশব্দে ওকে থাকতে হবে।'

সাপটাকে পিছনে ফেলে ওরা হেঁটে চলল। এই পাহাড়টার নিচের দিকটা যেমন ছড়িয়ে নত হয়ে নেমেছে ওপরের অংশটা ঠিক তার উল্টো। রীতিমত খাড়াই বলা চলে। তাই উঠতে বেশ কষ্ট। সুশান্ত ফিসফিস করে নাগরাজনকে বলল, 'রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ যদি একটা মুর্খন বেরিয়ে পড়ে তাহলে কি করবি?'

মুর্খনের আলোচনা শুনে অ্যান্টনি ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। প্রশ্নের জবাব দিতে সে বলল, 'সচরাচর মুর্খনকে পথের মধ্যে দেখা যায় না। জঙ্গলে ঝোপঝাড়ের ভিতর সাপ থাকে। পাহাড়ে কাঠ কাটতে গিয়ে গ্রামের মানুষ মুর্খনের কামড়ে প্রাণ হারিয়েছে। তবে সাপ যখন জঙ্গলে চলাফেরা করে কিংবা বাসস্থান বদলায় তখন কেউ কেউ মুর্খনকে রাস্তা পার হতে দেখেছে।'

ন'টার আগেই তারা পাহাড়ের চূড়ায় এসে পৌঁছল। আঙ্কল যা বলেছিল তাই। জায়গাটা সমতল। সামনে তাকিয়ে নাগরাজন সহর্ষে বলে উঠল, 'ওই তো সমুদ্র।'

প্রলয় আর সুশান্ত দুজনেই দেখছিল। বিশাল এক জলাশয়ের মতো আরব সাগর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। চারপাশের দৃশ্যও নয়নাভিরাম। পাহাড়, বনজঙ্গল, রুপোলি পাতের মতো আঁকাবাঁকা সেই নদীটা,—বারবার দেখলেও যেন চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে না।

খানিকটা দূরে সেই কাঠের ঘরটা চোখে পড়ল।

অ্যান্টনি বলল, 'ওখানে আর যাচ্ছিনে। আমাকে দেখলেই বুড়োটা দাঁত খিঁচিয়ে তাড়া করবে।'

একটা গাছের তলায় অ্যান্টনি পা বিছিয়ে বসে রইল। সুশান্ত আর নাগরাজনকে সঙ্গে নিয়ে প্রলয় ধীরে ধীরে এগোল। কাঠের ঘরটার বাঁ দিকে একটা পরিষ্কার জায়গায় বিশ-পঁচিশ ফুট উঁচু খুঁটি পোঁতা। কেউ যেন দূর থেকে ইলেকট্রিক লাইন টেনে এনে সেই খুঁটির গায়ে জড়িয়ে দিয়েছে। মাথায় একটা ব্র্যাকেটের দুই দিকে বোধহয় পাঁচ'শ পাওয়ারের দুটো বাল্ব। একটা লাল, অন্যটা সবুজ।

ব্যাপারটা বুঝে নিতে প্রলয়ের অসুবিধে হয় নি। ইলেকট্রিক কারেন্টের সাহায্যেই আলো দুটো জ্বলে। পাহাড়ের চূড়ায় এই দুর্গম স্থানে কারেন্ট চুরি করলে কে তার খোঁজ রাখছে? সন্ধ্যেবেলা ঘণ্টা দুই আলোটা নজরে পড়ে। তারপর ওই পাগলাটে বুড়ো সুইচ অফ

করে সেটা নিভিয়ে দেয়। এতে আর কতটুকু কারেন্ট লাগে? এই নিয়ে তাই কারো মাথাব্যথা নেই।

প্রলয় ভাবছিল ব্যাপারটা সত্যি অদ্ভুত। সন্ধ্যে রাত্তিরে এই আলোটা কেন ঘন্টা দুই জ্বলে? মাঝে মাঝে মুখের অরুচি কাটানোর মতো লাল বাত্তির বদলে সবুজ বাল্বটা উজ্জ্বল আলো ছড়ায়। বহু দূর থেকে সেটা চোখে পড়ে।

পা টিপে টিপে ওরা এগোচ্ছিল। কাঠের ঘরের সেই বুড়োটার সঙ্গে প্রথম সম্ভাষণ কেমন হবে? লোকটা নাকি বদমেজাজী, কথা বলতে গেলেই দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে। প্রলয় নিজের মনে কয়েকবার মহড়া দিয়ে নিল। যদি তাদের অভিসন্ধি সে ঘুণাক্ষরেও টের পায় তাহলে আর রক্ষে আছে?

কিন্তু কাঠের ঘরের দরজাটা শুধু ভেজানো। ধারে কাছে কেউ নেই। তবে কি বুড়ো ঘুম থেকে এখনও ওঠে নি? কিন্তু বেলা তো অনেক হল। মাথার ওপর গাঢ় নীল আকাশ। উজ্জ্বল রৌদ্রে বন-পাহাড়, গাছপালা, মাঠঘাট যেন খুশিতে হাসছে।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে প্রলয় দরজার গায়ে হাত রাখল। একটু ঠেলতেই সেটা খুলে গেল। আশ্চর্য! ভিতরে কেউ নেই। লোকটা নিশ্চয় আশেপাশে কোথাও গেছে। তবে বেশী দূরে নয়। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসবে বলে দরজাটা শুধু ভেজিয়ে রেখেছে। প্রলয় মুহূর্তের মধ্যে তার কর্তব্য স্থির করে নিল।

নাগরাজন আর সুশান্তকে কাঠের ঘরটার পিছনে আত্মগোপন করে থাকতে নির্দেশ দিল। বুড়োটাকে ফিরতে দেখলেই যেন হুইসিল বাজিয়ে তাকে সতর্ক করে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘরের জিনিসপত্র সে উল্টে পাল্টে দেখে নিল। আঙ্কল যে ব্যাটারির কথা বলেছিল, কোণে সেটা পড়ে আছে। প্লাগ পয়েন্টের মুখে ইলেকট্রিক তার জড়ানো। আর একটা চৌকো মতন বাক্সের সঙ্গে তারের কনেকশন প্রলয়ের চোখে পড়ল। অস্ফুটে তার

মুখ দিয়ে শুধু বেরুল, চার্জার। ব্যাটারিটা যাতে চার্জ নিতে পারে এটা বোধহয় সেই ব্যবস্থা। এই ছোট্ট ঘরটার আরো জিনিসপত্র নেড়েচেড়ে সে তো বিস্ময়ে থ। এত রকমের যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জাম কেন প্রয়োজন হয় প্রলয় ধীরে ধীরে তার মর্মোদ্ধার করতে চেষ্টা করল। ওই লাল আলোর আড়ালে রহস্য যে এমন ঘনীভূত হয়েছে কাটাজাল গ্রামের লোকেরা তা কেমন করে বুঝবে?

কিন্তু প্রলয় যা ভাবছে তাই কি সত্যি? এখনও পর্যন্ত সবটাই তার অনুমান মাত্র। হয়তো এই কাঠের ঘরের বাসিন্দা পাগলাটে ধরনের লোকটা কোনো আপনভোলা বৈজ্ঞানিক। এককালে ল্যাবরেটরীতে তার বিষয়বস্তুর পরীক্ষা নিয়ে মশগুল ছিল। মাথার গণ্ডগোল হতে সব ছেড়েছুড়ে পালিয়ে আসে। তারপর পাহাড়ের চূড়ায় এই কাঠের ঘরটা বানিয়ে নির্জনে দিন কাটায়। ওই লাল আর সবুজ বাতিটা জ্বালিয়ে অতীতের কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সূত্র খোঁজার চেষ্টা করে।

হঠাৎ ঘরের পিছনে হুইসিলটা বেজে উঠতেই প্রলয় চটপট বেরিয়ে এল। কাঠের দরজাটা টেনে সে নিপাট ভালোমানুষের মতো রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। লোকটা তখন বেশ দূরে। একটা গাছের আড়ালে তাকে আংশিক দেখা যাচ্ছিল। সুশান্ত ইচ্ছে করেই হুইসিলটা জোরে বাজায়নি। বাঁশীর শব্দ শুনে লোকটা যদি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তাড়া করে আসে?

কাছে আসতেই প্রলয় তাকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল। লোকটার বয়স পঞ্চাশের মতো হবে। রগের চুলে পাক ধরেছে। বাজপাখির মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অনেকটা মঙ্গোলীয়ান ধাঁচের মুখ। সামান্য চ্যাপ্টা নাক, পাতলা ভ্রূ। সম্ভবতঃ আঘাতজনিত কারণে বাঁ-পাটা ঈষৎ টেনে চলে।

প্রলয়কে দেখে লোকটা রীতিমত অবাক হয়েছে মনে হল। এই পাহাড়ের মাথায় একটা তের-চোদ্দ বছরের ছেলে কিনা তার কাঠের

ঘরের দরজার সামনে একা দাঁড়িয়ে আছে ? কি মতলব ওর ? ছোঁড়ার বুকের পাটা তো কম নয় !

প্রায় ঝংকার দিয়ে সে ইংরাজীতে প্রশ্ন করল, 'তুমি কে হে ?'

প্রলয় ঘাবড়াল না। তবে কিছুটা ভয় পাওয়ার ভাণ করে মৃদুস্বরে জবাব দিল, 'আজ্ঞে স্টুডেণ্ট।'

এখানে কি মতলবে ঘুরঘুর করছ ?

'তা এখানে কি মতলবে ঘুরঘুর করছ ?'

'কোনো মতলব নেই।' প্রলয় দাঁত বের করে ঈষৎ হাসল। বলল, 'আমরা এমনি পাহাড়ে উঠেছি।'

'তোমরা মানে ? সঙ্গে বন্ধু-বান্ধব আছে নাকি ?' শ্যেনদৃষ্টিতে

পুনরায় সে প্রলয়কে নিরীক্ষণ করল। ফের চোখ নামিয়ে শুধোল, 'কোথায় তারা?'

'আজ্ঞে আপনার ভয়ে ওরা লুকিয়েছে।' প্রলয় চাটুকারের মতো নির্লজ্জ তোষামোদ করল। ফের মাথা নিচু করে বলল, 'যদি অনুমতি দেন তো এখুনি ডাকতে পারি।'

'হ্যাঁ, ডাক তাদের।' লোকটি যেন হুকুম করল।

প্রলয় ইঙ্গিত করতেই কাঠের ঘরের পিছন থেকে নাগরাজন আর সুশান্ত বেরিয়ে এল।

লোকটি আপাদমস্তক দুজনকেই পরীক্ষা করল। ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'কি নাম তোমাদের?'

সুশান্ত আর নাগরাজন নাম জানাতেই প্রলয় বলল,—'খড়্গাপুরে রেলওয়ে স্কুলে আমরা পড়ি। অ্যানুয়াল পরীক্ষা দিয়েছি। এবার ক্লাস টেন-এ উঠব।'

শুনে লোকটি যেন খুশি হল। ঈষৎ হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কোথায় আছ?'

'কাটাঙ্গালে।' ইঙ্গিতে নাগরাজনকে দেখিয়ে সে যোগ করল, 'এদের বাড়িতে।'

'পাহাড়ে উঠেছ কেন?' সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রলয়কে লক্ষ্য করছিল।

'এমনি, মানে ইচ্ছে করল তাই।' প্রলয় একটা ছোট্ট জবাব দিয়ে ওর প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইল।

লোকটি তবু বলল, 'পাহাড়ে উঠতে কেউ তোমাদের বারণ করেনি?'

'বারণ করবে কেন?' প্রলয়ের পাল্টা প্রশ্ন।

'পাহাড়ে বিপদ-আপদের ভয় আছে তাই।' প্রায় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে জবাব দিল। মুখ গম্ভীর করে বলল, 'এখানে জঙ্গলে মস্ত বড় পাইথন রয়েছে জানো?'

'পাইথন?'

'হ্যাঁ, তোমরা যাকে অজগর সাপ বল। একটা ছোট্ট ছাগলের বাচ্চাকে অনায়াসে গিলে খেতে পারে। তা ছাড়া আরো অনেক বিষধর সাপ যার ছোবলে মৃত্যু অনিবার্য।'

'কি সাঙ্ঘাতিক।' প্রলয়ের মুখ থেকে একটা ভয়ার্ত ধ্বনি বের হল।

লোকটি ফের বলল, 'মাঝে মাঝে জঙ্গলে হাতির পাল চলে আসে। বুনো হাতি তাড়া করলে আর রক্ষে আছে? কখনও দু-একটা চিতাবাঘও ছিটকে এসেছে। তা ছাড়া নিশুতি রাত্তিরে এই পাহাড়ে বসে আমি পেত্নীর কান্না শুনতে পেয়েছি।'

'পেত্নীর কান্না?' প্রলয় যেন ভয় পেয়ে এক পা পিছিয়ে এল।

'তবে আর কি বলছি?' চোখ দুটি বেশ বড়ো করে সে তাকাল। বলল, 'কোথা থেকে যে কান্নাটা ভেসে আসে তা ঠিক বুঝতে পারি না। তবে পাহাড়ের নিচে যে সব গ্রাম আছে, সেখানের লোকেও বোধহয় ওই কান্না শুনতে পায়।'

নাগরাজন হঠাৎ বলল, 'পাহাড়ের চূড়ায় একা থাকতে আপনার ভয় করে না?'

'ভয়? ভয় করবে কেন?' লোকটা যেন বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গি করল। তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'আমার অত ভয়-ডর নেই।'

প্রলয় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কাছে নিশ্চয় বন্দুক কিংবা রিভলবার আছে?'

জবাবে সে মাথা নাড়ল। ঈষৎ হেসে বলল, 'নেই শুনলেই কি তোমরা বিশ্বাস করবে? তবে পুলিসের লোক একবার তল্লাশী করে গেছে, কিছুই পায় নি।'

'আচ্ছা, পাহাড়ের মাথায় ওই রেড-লাইটটা কেন জ্বলে বলতে পারেন?' সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল।

লাল আলোর প্রসঙ্গ উঠতেই লোকটার মুখখানা কেমন বিরক্তিতে

ভয়ে গেল। প্রায় দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'পাহাড়ের মাথায় লাল আলো কেন জ্বলে তার কৈফিয়ত আমাকে দিতে হবে?'

জবাবে সুশান্ত কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ইঙ্গিতে প্রলয় তাকে নিরস্ত করল। চোখ পাকিয়ে মৃদু ধমক দিয়ে বলল, 'ওই লাল আলোটা নিয়ে তোর এত মাথাব্যথা কিসের?' ফের লোকটির দিকে তাকিয়ে বেশ নরম গলায় জানাল, 'পাহাড়ের মাথায় একটা লাল আলো জ্বললে কার কি যায় আসে বলুন? কাটাঙ্গালের লোকে এই নিয়ে আদৌ চিন্তা করে না।'

মিষ্টি কথায় লোকটি তুষ্ট হল। ঈষৎ হেসে বলল, 'সে কথা জানি। গ্রামের লোকের এই নিয়ে দুর্ভাবনা নেই। তবে লাল আলোর ব্যাপারটা আমারও কেমন যেন ভাল ঠেকছে না, বুঝলে? মনে হয় আলোটা যেন আশেপাশের গ্রামের লোকদের সাবধান করে দিচ্ছে।'

'সাবধান করে দিচ্ছে?' সুশান্ত কথাগুলি প্রায় পুনরাবৃত্তি করল।

'হ্যাঁ। বলছে, এই পাহাড়ে উঠ না বাপু। তাহলে বিপদ ঘটবে।' মুচকি হেসে ফের যোগ করল, 'রাত্তিরে পেত্নীর কান্না তো অনেকেই শুনেছে।'

নাগরাজন বলল, 'কিন্তু আলোটা তো মাঝে মাঝে সবুজ হয়। তখন লোকে ভাববে ওটা বুঝি গ্রীন সিগন্যাল দিচ্ছে।'

শুনে যেন সে তেড়ে এল। বাজখাই গলায় ধমকে বলল, 'তাহলে গ্রীন সিগন্যাল মানেটা কি দাঁড়াল? সন্ধ্যের পর অন্ধকারে সকলকে পাহাড়ে উঠতে বলছে?'

ওর ধমকানিতে নাগরাজন চুপ করে গেল। বিশ্বাস নেই, চটেমটে লোকটা যদি একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে? প্রলয় স্পষ্ট বুঝতে পারল লাল-সবুজ আলোর বিষয় নিয়ে কোনো আলোচনা ওর আদৌ পছন্দ নয়। প্রসঙ্গ বদলে তাই সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নামটা কি বলবেন আঙ্কল?'

মিষ্টি সম্বোধনে তার মুখের চেহারা বেশ নরম হল। প্রসন্ন দৃষ্টিতে প্রলয়ের দিকে তাকিয়ে সে জবাব দিল, 'আমার নাম গঞ্জালেশ—ভি. সি. গঞ্জালেশ।'

'আপনি কি গোয়ানিজ মানে গোয়ার বাসিন্দা?'

'ঠিক ধরেছ।' লোকটা ওর বিচক্ষণতার তারিফ করল। শেষে বলল, 'ইয়েস, আই অ্যাম এ গোয়ানিজ ক্রিশ্চান।'

'আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব আনন্দ হল আঙ্কল।' প্রলয় এবার ওর কাছ থেকে বিদায় চাইল। ঘড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে বন্ধুদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'চল, বেলা অনেক হয়েছে। দেরি হলে আম্মা আবার বকাবকি শুরু করবে।'

গাছের তলায় অ্যান্টনি শুয়ে দিব্যি এক ঘুম দিচ্ছে। নাগরাজনের ডাক শুনে সে ধড়মড় করে উঠে বসল। চোখ কচলাতে কচলাতে বলল, 'লোকটার দেখা পেলে?'

প্রলয় ঘাড় হেলিয়ে ইতিবাচক হাসল।

অ্যান্টনি তখুনি বলল, 'তোমাদের দেখে দাঁত খিঁচিয়ে তাড়া করে নি?'

'তাড়া করবে কেন?' নাগরাজন প্রশ্নটা তার দিকে ছুড়ে দিল। খানিকটা আত্মপ্রসাদের ভঙ্গিতে বলল, 'বরং গঞ্জালেশ আমাদের সঙ্গে রীতিমত গল্প করেছে।'

'তাই?' অ্যান্টনি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। ঈষৎ হেসে ফের বলল, 'কি জানি বাপু। ওর ডেরার কাছে উটকো লোককে দেখলেই তো চোখ পাকিয়ে লাঠি নিয়ে তাড়া করত। কাজকর্মে যারা পাহাড়ে ওঠে তারা আর এদিকটায় পা মাড়ায় না।'

সুশান্ত বলল, 'প্রলয় তো ওর কাঠের ঘরের ভিতরে ঢুকে জিনিসপত্র দেখে এসেছে।'

'আরি বাস!' অ্যান্টনি রীতিমত তালি বাজাল। প্রলয়কে লক্ষ্য

করে বলল, 'তোমার বুকের পাটা আছে বাপু। তবে হ্যাঁ, দেখতে পেলে ও কিন্তু তোমাকে আস্ত রাখত না।'

নাগরাজন বলল, 'লোকটার নাম গঞ্জালেশ, গোয়ার বাসিন্দা। ওর কাছ থেকে সে খবরও আমরা জেনে এসেছি। এমনিতে মানুষ ভালো। কিন্তু ওই লাল-সবুজ আলোর কথা জিজ্ঞাসা করতেই কেমন যেন খেপে উঠল।'

অ্যান্টনি বলল, 'ওর স্বভাবই অমনি পাগলাটে ধরনের। আর ভীষণ রগচটা, কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলেই যেন শিং উঁচিয়ে তাড়া করে আসে।'

প্রলয় শুধু বলল, 'লোকটা যে কেন পাহাড়ের মাথায় একটা কাঠের ঘর বানিয়ে বাস করছে সেটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না।'

সুশান্ত একটু চিন্তা করে বলল, 'এমনও তো হতে পারে লোকটা কোনো কলেজের অধ্যাপক ছিল। কিংবা ল্যাবরেটরিতে রিসার্চ করত। হঠাৎ মাথার গণ্ডগোল হতে সব ছেড়েছুড়ে এদিকে পালিয়ে আসে। তারপর এই পাহাড়ের মাথায় নির্জনে একা বাস করে।'

'তাই কি সম্ভব?' নাগরাজন পাল্টা প্রশ্ন করল। বলল, 'তাহলে নিশ্চয় ওর ছেলে-মেয়ে কিংবা আত্মীয়-স্বজন এসে জোর করে নিয়ে যেত। পাহাড়ের মাথায় এমনি অজ্ঞাতবাসে ফেলে রাখত না।'

মাথার চুলে হাত বুলিয়ে প্রলয় বলল, 'ওর ঘরের জিনিসপত্র দেখে আমারও তেমনি একটা ধারণা হয়েছিল। লোকটা হয়তো একসময় নানা বিষয় নিয়ে চর্চা করেছে। তারপর মাথার গণ্ডগোল হতে এদিকে পালিয়ে আসে। তবে এখন নাগরাজন যা বলছে সেটাও কিন্তু ভেবে দেখার মতো।'

'তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে বল?' সুশান্ত শুধোল।

ভ্রূ কুঁচকে প্রলয় চিন্তা করছিল। কয়েক সেকেণ্ড পরে বলল,

'গঙ্গালেশ কেন যে এখানে অজ্ঞাতবাসে রয়েছে সেটাই তো রহস্য মনে হয়।'

সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, ওর ঘরের মধ্যে তুই কি দেখতে পেলি প্রলয় ?'

'অনেক সাজ-সরঞ্জাম।' প্রলয় তখুনি জবাব দিল। বলল, 'একটা ব্যাটারি, তার সঙ্গে বোধহয় চার্জারও রয়েছে। এ ছাড়া একটা রিসিভিং সেট মনে হল দেখতে পেলাম।'

'রিসিভিং সেট ?' নাগরাজন বিস্ময়ে ভ্রূ কোঁচকাল।

প্রলয় বলল, 'হ্যাঁ, রীতিমত আধুনিক মানে যাকে বলে মডার্ণ সেট। নব্ ঘুরিয়ে অনেক চেষ্টা করেও টেকনিকটা ধরতে পারলাম না।'

নাগরাজন বলল, 'তাহলে শুধু গঙ্গালেশ নয়, তার ঘরের যন্ত্রপাতিও বেশ রহস্যময়।'

'হ্যাঁ।' প্রলয় চাপা গলায় জবাব দিল। শেষে বলল, 'ওই লাল-সবুজ আলোর আড়ালে একটা রহস্য লুকিয়ে আছে। সেটা খুঁজে বের করতে পারলেই গঙ্গালেশের এই অজ্ঞাতবাস এবং তার কাঠের ঘরের যন্ত্রপাতির কৌশল কোনোটাই আর দুর্বোধ্য মনে হবে না।'

আট

বাড়ি ফিরতেই আম্মা যেন তাড়া করে এল। বলল, 'কোথায় গিয়েছিলে তোমরা ? ঘড়ির কাঁটায় ক'টা বাজল সে খেয়াল আছে ?'

নাগরাজন অম্লানবদনে জানাল, 'একটু কালিকটে গিয়েছিলাম।'

'হঠাৎ কালিকটে কেন ?' নাগরাজনের বুড়ি ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করল ।

ঢোক গিলে সুশান্ত বলল, 'ইয়ে মানে আঙ্কল আব্রাহাম যাচ্ছিলেন কিনা, তাই নাগরাজন বলল, 'চল, আমরাও এক চক্কর ঘুরে আসি।'

'তা বাড়িতে বলে গেলেই পারতে।' আম্মাকে ঈষৎ ক্ষুব্ধ মনে হল। ফের কণ্ঠস্বর প্রায় স্বাভাবিক করে বলল, 'বেলা একটা বাজতে চলল অথচ তোমরা ফিরছ না দেখে আমি তো ভেবে মরি।'

ঘরের ভিতর ঢুকে প্রলয় প্রায় চাপা গলায় বলল, 'ছি-ছি ! আম্মাকে মিথ্যে কথা বলতে এত খারাপ লাগছিল।'

সুশান্ত আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলল, 'এ ছাড়া কি উপায় ছিল ? পাহাড়ে গিয়েছিলাম শুনলে আম্মা ঠিক তেলেবেগুনে জ্বলে উঠত। নাগরাজনকে আর আস্ত রাখত না।'

প্রসঙ্গটা যেন বেশী দূর না গড়ায় বোধহয় সেজন্যই নাগরাজন জবাব দিল, 'সত্যি কথাটা না হয় পরে বলতাম। তা ছাড়া আমরা তো একটা অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছিলাম। এখনই যদি মতলব ফাঁস করে ফেলি তাহলে প্রতিপক্ষ সাবধান হবার সুযোগ পাবে।'

খাওয়ার পর তিন বন্ধু সটান ঘুমিয়ে পড়ল। অভ্যেস নেই, পাহাড়ে ওঠা-নামা করে গায়ে-পায়ে ব্যথা। তাই ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসতে দেরি হল না। যখন ঘুম ভাঙল, তখন রোদ নারকেল

গাছের মাথায়—ডিসেম্বরের সন্ধ্যে মাটির বুকে নেমে আসতে সামান্য বাকি আছে।

রিসিভিং সেটটা নিয়ে প্রলয় নাড়াচাড়া করছিল। প্লাগটা সুইচ বোর্ডে গুঁজে দিয়ে সে নব্‌টা ঘোরাল। তার রিসিভিং সেটে ভূমি-তরঙ্গ ধরবার একটা বিশেষ ব্যবস্থা আছে। অন্যমনস্কের মতো প্রলয় সেটের কাঁটা একদিকে সরিয়ে যাচ্ছিল। যে ভূমি-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বেশ কয়েক সহস্র কিলো সাইকিলের কাছাকাছি, কাঁটাটা হঠাৎ তেমনি একটা জায়গা স্পর্শ করতেই কার ক্ষীণকণ্ঠ যেন বহু দূর থেকে ভেসে এল। কৌতূহলী প্রলয় ভল্যুম্ বাড়ানোর নব্‌টা সামান্য ঘোরাতেই স্বরটা স্পষ্ট শোনা গেল। ইংরাজীতে কে যেন একটা করিতার মতো কিছু আবৃত্তি করছে।

প্রলয় কান পেতে শুনল, কেউ যেন বলছে—

দি শিপ ইন অ্যাঙ্কর
টু নট ফার
নাউ গ্রীন সিগন্যাল
মেক অল অ্যাওয়্যার—।
বাই মিডনাইট
কাম মেন হিয়ার
ক্যাশ অন ডেলিভারি
টার্মস্ ক্লিয়ার।

একবার নয়, অন্ততঃ আট-দশবার ওই কবিতাটা প্রলয় শুনতে পেল। তিন-চার মিনিট পর পর পৌণপৌণিক দশমিক অঙ্কের মতো লোকটি কথাগুলি আউড়ে যাচ্ছিল। আধঘণ্টারও বেশী সময় কবিতাটা অমনি কিছুক্ষণ ব্যবধানে আবৃত্তি করে অবশেষে সে থামল।

ইতিমধ্যে একটা কাগজ টেনে নিয়ে খসখস করে কবিতার

লাইনগুলি প্রলয় লিখে ফেলল। ঘুম জড়ানো চোখে সুশান্ত তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'শুনে শুনে ওটা কি লিখলি? ইংরেজী গান নাকি?'

'গান নয় মেসিনগান।' প্রলয় গম্ভীরমুখে জবাব দিল।

তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বল দিকি?'

'ব্যাপার গুরুতর'। প্রলয় প্রাণপণে তার গাম্ভীর্য বজায় রাখছিল।

নাগরাজন মিনতি করল, 'বল না ভাই। কান পেতে এতক্ষণ কি শুনলি?'

হঠাৎ ফিক করে হেসে প্রলয় বলল, 'জানিস, আমার এখন একটা গান ধরতে ইচ্ছে করছে।'

'গান?'

'হ্যাঁ।' বলেই সে হেঁড়ে গলায় শুরু করল—

অঙ্ক ছেড়ে পাইথোগোরাস
গাইতে এলেন মঞ্চে কোরাস
তাই না দেখে তালি বাজায়
ব্রাজিলের এক ডাইনোসোরাস।

গানের সঙ্গে প্রলয় ধেই-ধেই করে নাচছিল।

নাগরাজন বলল, 'কিরে, এত উল্লাস কিসের? তোর মাথায় গণ্ডগোল হল নাকি?'

'মাথার গণ্ডগোল হবে কেন?' প্রলয় চোখ পাকিয়ে এক বিচিত্র মুখভঙ্গি করল। ফের হেসে বলল, 'আসলে কি জানিস? ইউরেকা—'

'তার মানে?'

'মানে পেয়ে গেছি।' নিচের ঠোঁটটা ঈষৎ কামড়ে ধীরে ধীরে সে বলল, 'আমার বিশ্বাস আজ রাত্তিরেই ওই লাল-সবুজ আলোর রহস্যের জাল ছিন্নভিন্ন হবে।'

নাগরাজন ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। ভাবটা এই যে, অথ কিম্? তাদের কি করণীয়?

'আগে চল।' প্রলয় প্রস্তাব করল, 'পাহাড়ের চূড়ায় আজ সবুজ আলো জ্বলেছে কিনা দেখে আসি।'

সুশান্ত বলল, 'সবুজ আলো যে জ্বলবে তার কি মানে আছে? লাল আলোও হতে পারে।'

ইতিমধ্যে ঘরের বাইরে পাতলা সন্ধ্যে নেমেছে। গাছগাছালির আড়ালে ঘন অন্ধকার। জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে প্রলয় দেখল নারকেল গাছের মাথায় এক ফালি চাঁদ, আকাশে তিন-চারটে তারা ফুটেছে। ঘড়ির কাঁটায় পৌনে ছ'টা বাজছে দেখে সে ব্যস্ত হয়ে বলল, 'চল, আর দেরি করলে পরে পস্তাতে হবে।'

নাগরাজনের বাড়ি থেকে পাহাড়টা দেখা যায়। কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখে এলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। অগত্যা পায়ে জুতো বেঁধে তিনজনে চটপট বেরিয়ে এল। তবে বেশী দূর যেতে হল না। বড় রাস্তার কাছাকাছি একটা ফাঁকা জায়গা—সেখানে পৌঁছতেই পাহাড়ের চূড়ার কিছু অংশ চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু প্রলয় যা বলেছিল তাই তো ফলে গেছে। পাহাড়ের মাথায় লাল বাতি নয়, সবুজ আলোটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

সুশান্ত ঈষৎ বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'আশ্চর্য! লাল আলোটা আজ সবুজ হয়ে গেল।'

প্রলয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে নাগরাজন জিজ্ঞাসা করল, 'পাহাড়ের উপরে আজ সবুজ আলো জ্বলবে তুই কেমন করে সেটা টের পেলি?'

মাথার চুলে হাত বুলিয়ে প্রলয় জবাব দিল, 'ওসব কথা পরে হবে। এখন তাড়াতাড়ি চল, আঙ্কল আব্রাহামের সঙ্গে একটা যুক্তি করা দরকার।'

'এই রাত্তিরবেলা আঙ্কলের কাছে কেন?' নাগরাজন মৃদু আপত্তি জানাল। ফের বলল, 'কাল সকালে গেলে হয় না?'

'না।' প্রলয় দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল। বেশ আস্থার সঙ্গে বলল, 'শুধু আঙ্কলের কাছে কেন? এখুনি হয়তো আমাদের কালিকটে যেতে হতে পারে।'

'কালিকটে?'

'ইয়েস', প্রলয় বিড়বিড় করল। তেমনি মৃদুস্বরে বলল, 'আর তখনই শুরু হবে আমাদের নতুন অ্যাডভেঞ্চার—যার নাম অপারেশান সী।'

বৃত্তান্ত শুনে আব্রাহাম চমকে উঠলেন। তবু একটু সন্দেহ থেকে যাচ্ছিল, তাই প্রলয়কে ফের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি ঠিক শুনেছ তো? মানে কোনো ভুল-টুল হয় নি?'

প্রলয় ঈষৎ হাসল। বলল, 'কবিতার ওই কথাগুলো শুধু একবার নয়, আধঘণ্টা ধরে আমি বেশ কয়েকবার শুনেছি।'

চেয়ার ছেড়ে আব্রাহাম সটান উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের মধ্যে বার দুই-তিন পায়চারি করলেন। কৃষ্ণপক্ষ, বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বাজল। ঈষৎ চাপা গলায় তিনি শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা তৈরি হয়ে এসেছ?'

তিনজনে ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল।

আব্রাহাম জানতে চাইলেন, 'রাত্তিরে আম্মা যখন তোমাদের খোঁজ করবে?'

'উপায় নেই।' প্রলয় চটপট জবাব দিল। 'ব্যাপারটা এখন গোপন রাখতে হবে। এই অন্ধকারে কালিকট যেতে আম্মা কখনও পারমিশন দেবে না। আর তাহলেই সব মাটি।

কাল সন্ধ্যেবেলা পাহাড়ের মাথায় আবার লাল আলো দেখতে পাবেন।'

আব্রাহাম এক মুহূর্ত ভেবে বললেন, 'তাহলে একটু অপেক্ষা কর, আমি তৈরি হয়ে নিই।'

শেষ পর্যন্ত কি ঘটবে সুশান্ত কিংবা নাগরাজন কেউ জানে না। আপাততঃ কালিকট যেতে হবে শুধু এইটুকু শুনেছে। দু-তিনবার প্রলয়কে জিজ্ঞাসা করেছিল। জবাবে সে একটি কথাও প্রকাশ করেনি। একবার সামান্য বিরক্ত হয়ে বলল, 'দু ঘণ্টা ধৈর্য ধর, তাহলেই সব জানতে পারবি।'

সওয়া আটটা নাগাদ কালিকটের বাস এল। দিনের বেলা এই রুটে আধঘণ্টা অন্তর গাড়ি। রাত্তিরে ব্যবধানটা বেড়ে প্রায় এক ঘণ্টা হয়। কালিকটগামী লাস্ট বাস সাড়ে দশটা নাগাদ কাটাগালে আসে। আটটার বাসটা ধরতে না পারলে আরো এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হত।

সামনের গেট দিয়ে প্রলয় আর সুশান্ত ভড়িঘড়ি গাড়িতে উঠল। পিছনের দরজায় আব্রাহাম আর নাগরাজন। ঘাড় ফেরাতেই নাগরাজন মুচকি হেসে জানাল, 'ফ্রন্ট গেট মেয়েদের জন্য, বুঝলি? কেরালাতে ছেলেরা পিছনের দরজা দিয়ে ওঠে।'

প্রলয়ের হঠাৎ মনে হল পিছনের গেট দিয়ে শুধু আব্রাহাম আর নাগরাজন নয়, আরো কেউ যেন বাসে উঠল। শেষের সারির আসনের এক কোণে সে নিঃশব্দে বসেছে। স্বল্পালোকে দ্রুতগামী বাসে ঠিক নজর হয় না। তবু প্রলয়ের মনে হল লোকটার গালে লম্বা জুলপি, নাকের নিচে বেশ ঘন গোঁফ, চিবুকের কাছে ছোট্ট একটু কাটা দাগ। কিন্তু বাস স্টপে তো কই অন্য কোনো লোক তার নজরে পড়ে নি। তবে কি শেষ মুহূর্তে প্রায় দৌড়ে এসে পিছনের গেটের পাদানীতে সে লাফ দিয়ে উঠেছে?'

কালিকট শহরটা বেশ বড়ো। চওড়া রাজপথ, দুপাশে অজস্র বিপণি। সর্বত্র ঝলমলে নিওন আলো। রাত প্রায় ন'টা, তবু বাস

স্ট্যাণ্ডে ভিড়ের কমতি নেই। তাও শহরে হুটো বাস-স্ট্যাণ্ড,—একটা সরকারী পরিবহন অপরটি প্রাইভেট বাসের।

রাস্তায় নেমে সন্দেহটা ঘনীভূত হল। কেউ যেন তাদের ফলো করছে। এমনিতে বোঝা শক্ত, মনে হবে যেন সে স্বাভাবিক হাঁটছে। কিন্তু প্রলয় দু-পা এগিয়ে নাগরাজনকে সামান্য আড়াল করে ঘাড় ফিরিয়ে লক্ষ্য করল। যা ভেবেছিল ঠিক তাই—লোকটা ভালোমানুষের মতো অন্যমনস্ক সেজে তাদের অনুসরণ করছে।

কাছেই কয়েকটা অটো দাঁড়িয়ে। চটপট তারা দু'টো দখল করে বসল। একটাতে আব্রাহামের সঙ্গে প্রলয়, অন্যটিতে সুশান্ত আর নাগরাজন। প্রলয়দের গাড়িটা সামনে, কারণ আব্রাহাম পথপ্রদর্শক। কালিকট শহরের পথ-ঘাট কারো রপ্ত নয়। নাগরাজনের এখানে বাড়ি হলে কি হবে, ছেলেবেলা থেকেই খড়্গপুরে মানুষ,—বছরে এক-আধবার কাটাঙ্গালে আসে। কালিকটের সঙ্গে তার যোগাযোগ সামান্য।

কিছু দূর যেতেই প্রলয় পি। ফিরে তাকিয়ে দেখল তাদের দুটো অটোর সঙ্গে বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখে আর একটা গাড়ি ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে। মিনিট পনের বাদে তাদের অটো ছুটি শহরের এক প্রান্তে এসে থামল। গাড়ি থেকে নেমেই প্রলয় ঘাড় ফিরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। হ্যাঁ, হেডলাইট নিভিয়ে সেই অটোযানটিও পঞ্চাশ গজ দূরে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে সন্তর্পণে দাঁড়াল। ব্যাপারটা সে সহজভাবেই মেনে নিতে চেষ্টা করল। এমন অভিযানে নানারকম ঝক্কি থাকতেই পারে। আর শত্রুপক্ষ কি হাত গুটিয়ে বসে আছে? এই রাত্তিরে তারা চারজনে মিলে কাটাঙ্গাল থেকে কেন কালিকটে এল, বিপক্ষ নিশ্চয় তার কারণ খুঁজে বের করবে।

সামনেই একটা লোহার গেট। থামের গায়ে ইংরাজীতে লেখা—আর. পদ্মনাভন, অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর, সী কাস্টমস্।

আব্রাহাম ফিসফিস করে বলল, 'এর কাছেই তোমাদের নিয়ে এলাম। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয়।'

সুশান্ত নিঃশব্দে প্রলয়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'গাড়ি থেকে নেমে ঘাড় ফিরিয়ে কি অত দেখছিলি?'

মৃদুস্বরে প্রলয় জবাব দিল, 'বি কেয়ারফুল। বোধহয় পিছনে ফেউ লেগেছে।'

'ফেউ?'

'ইয়েস। ফেউ মানে গুপ্তচর—ইংরাজীতে যাকে স্পাই বলে।' এক মুহূর্ত থেমে আগের মতো ফিসফিস করে সে বলল, 'আমাদের গতিবিধির ওপর শত্রুপক্ষের তীক্ষ্ণ নজর।'

গেট ঠেলে আব্রাহাম ভিতরে ঢুকলেন। পিছনে প্রলয়, তারপর সুশান্ত আর নাগরাজন। ঘেউ ঘেউ করে একটা কুকুর সরব হতেই সামনের আলোটা জ্বলে উঠল। দরজা খুলে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বেশ শক্তসমর্থ গড়ন, মাঝারি উচ্চতা। পরনে দক্ষিণীদের ঢঙে লুঙ্গির মতো করে পরা একখণ্ড বস্ত্র, গায়ে জামা।

এত রাতে আব্রাহামকে দেখে ভদ্রলোক ইংরাজীতে প্রশ্ন করলেন—'হোয়াটস্ দি ম্যাটার? অর্থাৎ কা চ বার্তা?'

ঘরের ভিতরে ঢুকে আব্রাহাম মুখ খুললেন। ঝাড়া দশ মিনিট ধরে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা—বেশ কিছুদিন হল পাহাড়ের মাথায় রহস্যময় লাল-সবুজ আলো—তারপর কবিতার ঢঙে পড়া যে ক'টি লাইন রিসিভিং সেটে প্রলয় আধঘণ্টার মতো শুনতে পেয়েছে তার কিছুই বাদ দিলেন না।

পদ্মনাভন হাত বাড়িয়ে প্রলয়ের কাছ থেকে কাগজটি চেয়ে নিলেন। ওই কাগজেই কবিতার লাইন ক'টি লেখা ছিল।

আব্রাহাম পুনরাবৃত্তি করলেন, 'রিসিভিং সেটে এই কবিতা প্রলয় বারবার শুনেছে।'

পদ্মনাভন মাথা নাড়লেন। কাগজটার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে বললেন, 'এটা কবিতা নয়।'

'তাহলে ?'

'দিস ইজ ওয়্যারলেস মেসেজ। কাছাকাছি কোনো জাহাজ থেকে বেতারে এই খবর পাঠিয়েছে।'

'জাহাজটা যে খুব কাছেই সে কথা ওর মেসেজেই বলা আছে। এখান থেকে মাত্র টু নট্ দূরে।' প্রলয় জানাল।

'কিন্তু নট্ মানে তো গেরো।' সুশান্ত হঠাৎ বলে উঠল। 'তাহলে জাহাজটা কত দূরে রয়েছে তা আমরা কেমন করে বুঝব ? তা ছাড়া টু নট্ যার মানে বেশি দূরে নয়, তাও হতে পারে।'

পদ্মনাভন মৃদু হেসে প্রলয়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই সে চটজলদি ব্যাখ্যা করল, 'এখানে নট্ মানে সামুদ্রিক মাইল—যা সমুদ্রপৃষ্ঠে দূরত্বের একক। বানান হল KNOT. এক KNOT প্রায় 6080 ফুট,—অর্থাৎ এক মাইলের থেকে 800 ফুট বেশী।'

'রাইট।' কথার সুরে পদ্মনাভন ওর বুদ্ধির তারিফ করলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে জানালার বাইরে ধপ করে মাটিতে কোনো ভারী বস্তু পতনের শব্দ হল। পদ্মনাভন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই প্রলয় চাপা গলায় কথা কইল, 'খবরটা বলতেই ভুলে গেছি। মনে হল কেউ আমাদের ফলো করছে।'

জানালার কাছে না গিয়ে পদ্মনাভন তাঁর চেন-বাঁধা সারমেয়টিকে ছেড়ে দিলেন। সর্বাঙ্গে ঘন লোম-অলা একটা লম্বাটে ধরনের কুকুর। মুখটা বিশ্রী চ্যাপ্টা। ছাড়া পেতেই বিদ্যুৎগতিতে ঘর ছেড়ে জানালার ফাঁক দিয়ে সে বাইরে লাফিয়ে পড়ল। আর সেই সঙ্গে একটা আর্ত চিৎকার।

দরজা খুলে পদ্মনাভন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। পিছনে আব্রাহাম, প্রলয়, নাগরাজন আর সুশান্ত। চোখের সামনে এক অদ্ভুত দৃশ্য। গেটের মাথায় চড়ে একটা লোক প্রাণপণে নিজেকে

বাঁচাতে চেষ্টা করছে। আর লোম-অলা কুকুরটা পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তার একটা পা কামড়ে ধরতে চাইছে।

পদ্মনাভন কাছে এসে কুকুরকে টেনে ধরলেন। পর মুহূর্তেই কোমরে গোঁজা ছ-ঘড়া রিভলবারটা ওর দিকে তাগ করে সুস্পষ্ট আদেশ দিলেন, 'নেমে এস।'

লোকটা সুড়সুড় করে নেমে এল।
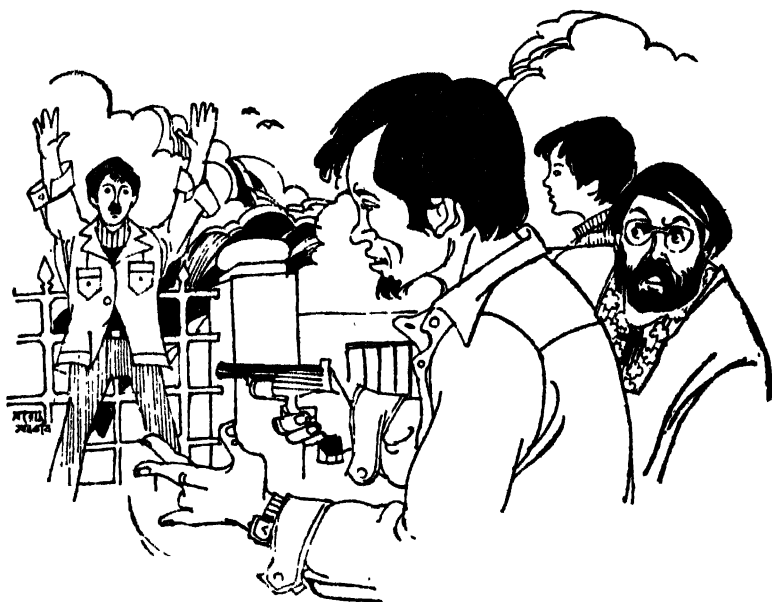
লোকটা সুড়সুড় করে মাটিতে পা রাখল। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দুটি হাত ওপরে তোলা। কালবিলম্ব না করে প্রলয় তার দিকে এগিয়ে গেল। লোকটির জামার পকেট হাতড়ে দেখল। কোমরে ছুরি কিংবা আগ্নেয়াস্ত্র গোঁজা আছে কিনা তাও সার্চ করল। না, সে নিরস্ত্র। তবু সাবধানের মার নেই। কলকাতা থেকে আনা দড়িটা ব্যাগে ছিল। মুহূর্তে সেটা বের করে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে লোকটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

পদ্মনাভন বললেন, 'ভাগ্যিস ধরা পড়ল। পিছলে বেরিয়ে গেলে আর রক্ষে ছিল না। আধঘণ্টার মধ্যে সর্বত্র খবর পৌঁছে যেত। আর তাহলেই পাখি ফুড়ুৎ—সব ভোঁ-ভাঁ। কারো টিকি দেখতে পেতাম না।'

নাগরাজন শুধোল, 'লোকটাকে এক্ষুনি পুলিসে হ্যাণ্ড-ওভার করবেন?'

'সার্টেনলি,' পদ্মনাভন জবাব দিলেন। বললেন, 'আজ রাত্তিরটা হাজতবাস করুক। অপারেশান থেকে ফিরে ওর একটা ব্যবস্থা করলেই হবে।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রলয় হঠাৎ বলল, 'সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। হাতে আর ঘণ্টা দুই সময়—'

ইতিমধ্যে চেঁচামেচি আর কুকুরের ডাক শুনে বাড়ির পিছন থেকে দুজন লোক এসে খানিকটা দূরে দাঁড়াল। চেহারা আর বেশবাস দেখে প্রলয়ের মনে হল ওরা কাস্টমসে কাজ করে। সম্ভবতঃ নাইট-গার্ড কিংবা এই ধরনের কোনো পোস্টে। নিশ্চয় কম্পাউণ্ডের ভিতরে ওদের কোথাও আবাস রয়েছে।

পদ্মনাভন ইঙ্গিতে দুজনকে কাছে ডেকে পিছমোড়া করে বাঁধা লোকটাকে পাহারা দিতে বললেন। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে ফের নিজের ঘরে ঢুকলেন। দেরি না করে টেলিফোনে একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে মালয়ালী ভাষায় কথা শেষ করে জামাকাপড় বদলাতে ভিতরে চলে গেলেন।

পাঁচ মিনিটও কাটেনি। হেড লাইটের চোখ-ধাঁধানো আলো ফেলে পুলিসের একটা জিপ এসে ভিতরে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে একজন সাব-ইন্সপেক্টর নামলেন, সঙ্গে দুজন সিপাই। পিছমোড়া করে বাঁধা লোকটিকে দেখে তাদের কর্তব্য বুঝে নিতে এক মুহূর্তও দেরি হল না। বাঁধন ঈষৎ আলগা করে সিপাইরা ওকে টেনে জিপে তুলল। ইতিমধ্যে পোশাক পাল্টে পদ্মনাভন এসে গেছেন। সাব-

ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দু-চার কথা হবার পর আসামীকে নিয়ে জিপটা বেরিয়ে গেল।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে পদ্মনাভন এবার ব্যস্ত হলেন। কিন্তু তাঁর দুশ্চিন্তার অবসান ঘটাতে তখুনি একটা সরকারী গাড়ি গেট পেরিয়ে কম্পাউণ্ডের ভিতরে এসে থামল। পোশাক-পরা একজন অফিসার দরজা খুলে প্রায় লাফ দিয়ে বেরিয়ে বলল, 'ইয়েস স্যর। উই আর রেডি।'

গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া অন্য যাত্রী নেই। পদ্মনাভনও যাবার জন্য প্রস্তুত। প্রলয় মাথার চুলে দ্রুত হাত বুলিয়ে নিল। তবে কি তাদের এখন কাটাঙ্গালে ফিরে যেতে হবে? কই, পদ্মনাভন তো একবারও সঙ্গে নেবার কথা বলেন নি। অথচ ওই ক্লুটা অর্থাৎ কবিতার লাইনগুলি প্রলয় প্রথম শুনেছে। তাহলে? কিংবা পাহাড়ের চূড়ার ওই লাল-সবুজ আলোর রহস্য ভেদ করে পদ্মনাভন একা সেই সম্মানের অধিকারী হতে চান?

কিন্তু প্রলয় একটু ভুল ভেবেছিল। ঈষৎ হেসে আগন্তুক অফিসারটিকে উদ্দেশ্য করে পদ্মনাভন বললেন, 'মুসা, আজকের অপারেশানের সব কৃতিত্ব কিন্তু এই তিনটি ছেলে দাবি করতে পারে। এদের সাহায্যেই হয়তো আজ এক দুষ্টচক্রকে আমরা সমূলে উৎপাটিত করতে পারব।'

মুসা সহাস্যে তাদের লক্ষ্য করে বলল, 'ইয়ং বয়েজ। আজকের অপারেশানে তোমরা কি আমাদের সঙ্গী হবে?'

প্রলয় এক পায়ে রাজি। মৃদু হেসে জবাব দিল, 'পাহাড়ের ওই লাল-সবুজ আলোর রহস্য ভেদ করব বলেই তো নাগরাজনের সঙ্গে কাটাঙ্গালে এসেছি।'

সুশান্ত চটপট বলল, 'প্রলয়কে কোথাও একা যেতে দিতে পারি না। ওর পাশে আমাকে থাকতেই হবে।'

বাকি শুধু নাগরাজন। কৌতুক করে সে বলল, 'অপারেশানে

না গিয়ে তো উপায় নেই। একা বাড়ি ফিরলে আম্মা কি আমাকে আস্ত রাখবে ?'

শুধু আব্রাহাম চুপ করে ছিলেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'আমার এই বুড়ো হাড়ে অত ধকল সইবে না। আমি এখানেই রইলাম। অপারেশান থেকে এলে তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে কাটাঙ্গালে ফিরব।'

মুসার দিকে তাকিয়ে নাগরাজন জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু এই অপারেশানের নামটা কি ?'

'কেন ?' পদ্মনাভন জবাব দিলেন। 'নাম তো জলের মতো সোজা।'

'আমি বলতে পারি।' এক মুহূর্ত মুসা এবং পদ্মনাভনের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রলয় বলল, 'এর নাম অপারেশান সী।'

নয়

মহাসমুদ্রের বুকে মোটর বোটখানা ঠিক মোচার খোলের মতো লাগছে। একটা নয়, সামনে-পিছনে অন্ততঃ চার-খানা বোট। সন্তর্পণে ধীর গতিতে এগোচ্ছে। প্রথম বোট-খানায় আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত আটজন লোক, শেষেরটিতেও তাই। মাঝের দুখানি বোটের একটিতে পদ্মনাভন এবং তার সঙ্গে প্রলয়। এ ছাড়া চার-পাঁচজন রক্ষী। অন্য বোটটিতে মুসার সঙ্গে নাগরাজন আর সুশান্ত। রক্ষীর সংখ্যা দু-একজন কম-বেশী হতে পারে।

পশ্চিম উপকূলে আরব সমুদ্র অগভীর, তীরের কাছে তো নিশ্চয়। জলে ঢেউ নেই। শুল্ক বিভাগের এই বোটগুলি এমনভাবে তৈরী যে ইঞ্জিনের শব্দ সামান্য দূর থেকেও শোনা যায় না। জলযানগুলি তাই রাজহাঁসের মতো দিব্যি জল কেটে তরতর করে এগিয়ে চলেছে।

কৃষ্ণপক্ষ। ঘন অন্ধকার চারপাশে। তাদের গন্তব্যস্থল ঠিক কত দূর বোটে বসে প্রলয় কিছুতেই ঠাহর করতে পারল না। সমুদ্রের বুকে হঠাৎ আলেয়ার মতো দপ করে এক ঝলক আলো দেখা দিয়ে ফের নিভে গেল। তার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে পদ্মনাভন বললেন, 'ওই আলো অ্যালডিস্ ল্যাম্পের। শক্তিশালী টর্চের মতো জোরালো লাইট হয়। সমুদ্রের বুকে ভাসমান দুই জাহাজের মধ্যে এই আলোর সাহায্যে সংবাদ বিনিময় হতে পারে। খবর পাঠানো হয় মর্স কোডে, যেমন টরে-টক্কা। আলো জ্বলে উঠলে টরে, নিভলে টক্কা।'

ঠিক তখুনি বহু দূরে সমুদ্রের এক কোণে এমনি জোরালো একটা আলো কয়েকবার জ্বলে উঠল, নিভল। মিনিট দুই-তিন বাদে সমুদ্রের অন্য এক কোণ থেকে ঠিক তেমনি আলো জ্বলে ফের নিভতে শুরু হল। পদ্মনাভন জিজ্ঞাসা করলেন, 'দুই পক্ষের কি সংবাদ বিনিময় হল বুঝতে পারলে?'

প্রলয় মাথা নাড়ল।

ঈষৎ হেসে পদ্মনাভন ব্যাখ্যা করলেন, 'প্রথম জাহাজটা জিজ্ঞাসা করল, হুইচ শিপ্, হোয়্যার বাউণ্ড? দ্বিতীয় জাহাজ জবাব দিল, জামাইকান ফ্রেটার,—কলম্বো বাউণ্ড।'

আরো মিনিট দশ পরে মোটর বোটগুলির ইঞ্জিন স্তব্ধ হতেই সেগুলি ধীরে নিশ্চল হল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে পদ্মনাভন বললেন, 'আমরা মধ্যরাত্রির প্রতীক্ষায়। মিডনাইট হতে আর আধ-ঘণ্টা দেরি।'

'সমুদ্র এখানে কত গভীর?' প্রলয় শুধোল।

'ঠিক বলা শক্ত। তবে কুড়ি ফ্যাদম্ পর্যন্ত হতে পারে। এক ফ্যাদম্ ছ-ফুটের মত।' পদ্মনাভন জবাব দিলেন। মৃদু হেসে ফের প্রশ্ন করলেন, 'সমুদ্রের গভীরতা কেমন করে মাপবে বলতে পার?'

'প্রতিধ্বনির সাহায্যে।' প্রলয় চটপট জবাব দিল। বলল 'শুনেছি জাহাজে ইকো-রিসাউণ্ডার নামে একটা যন্ত্র থাকে। তার মাধ্যমে সমুদ্রের অতলে একটা চৌম্বক তরঙ্গ পাঠালে গ্রাফ কাগজে গভীরতা আর সময়, দুই ফুটে উঠবে।'

ততক্ষণে মুসার মোটর বোটখানা প্রায় তাদের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। সুশান্ত চাপা গলায় প্রশ্ন করল, 'নোঙর-করা জাহাজটা কোথায়?'

পদ্মনাভন জবাব দিলেন, 'আমাদের খুব কাছেই। বাঁ দিকে তাকালেই টের পাবে।'

শুধু সুশান্ত কেন, প্রলয় আর নাগরাজনও তাকিয়ে দেখল একটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় প্রাণীর মতো জাহাজটা গাঢ় অন্ধকারে প্রায় আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও আলো নেই, শুধু মাথায় একটা রেড-লাইট ছাড়া। তার অস্তিত্ব যাতে কেউ না বুঝতে পারে সম্ভবতঃ সেজন্যই এই সতর্কতা।

মুসা হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা ওরায়নকে চিনতে পারছ?'

'ওরায়ন মানে?' সুশান্ত পাল্টা প্রশ্ন করল।

'কেন? যাকে তোমরা কালপুরুষ বল।'

ঈষৎ হেসে প্রলয় জবাব দিল, 'শীতের সন্ধ্যায় ওরায়ন বা কালপুরুষকে পুব আকাশে দেখা যায়। আবার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে সন্ধ্যেবেলা মনে হবে যে পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে।'

মুসা জিজ্ঞাসা করল, 'এর ডান কাঁধের উজ্জ্বল বড় তারাটির নাম জানো?'

'হ্যাঁ, ওর নাম আর্দ্রা। আবার বাঁ পায়ের শেষ তারাটিও খুব ঝকঝকে,—তার নাম বাণরাজা।'

হঠাৎ জলের বুকে ছপ ছপ শব্দ শোনা গেল। পদ্মনাভনের কোলে একটা কক্কার স্প্যানিয়েল জাতের ছোট কুকুর। ট্রেইণ্ড ডগ্, পদ্মনাভন ওর নাম দিয়েছেন পম্‌পম্। সোনার বিস্কুট থেকে বিস্ফোরক পর্যন্ত ঘ্রাণ শুঁকে ঠিক বের করবে। বাঁ হাত দিয়ে পদ্মনাভন ওর মুখটা চেপে ধরলেন,—যাতে কুকুরটা না ডেকে ওঠে। সেই ছপ ছপ শব্দ ক্রমেই আরো নিকটে মনে হল। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে চারটি মোটর বোট যেন শিকারের প্রতীক্ষায় শ্বাপদের মতো ওত পেতে রয়েছে। হঠাৎ এক আশ্চর্য বিস্ময়ে প্রলয় তাকিয়ে দেখল সাত-আটখানা রোগা লম্বাটে ধাঁচের নৌকো দ্রুত দাঁড় টেনে সন্তর্পণে জাহাজটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মিনিট চার-পাঁচ আর কোনো সাড়া শব্দ নেই। তারপর হঠাৎ

জাহাজের আট-দশটা আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠল। দূর থেকে প্রলয় তাকিয়ে দেখল নৌকোগুলি জাহাজের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। অন্ততঃ চার-পাঁচজন লোক নৌকো ছেড়ে ডেক থেকে ঝোলানো দড়ির সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত ওপরে উঠে গেল।

পদ্মনাভন আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে মোটর বোটগুলিকে জাহাজের কাছে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। নৌকোতে যে লোকগুলি বসে তারা পালাবার উপক্রম করতেই দুজন রক্ষী আকাশের দিকে রাইফেলের নল তুলে গুলি ছুড়ল। ভয় পেয়ে তারা আর নড়ল না। কাঠপুত্তলীর মতো নির্বাক বসে রইল। মুসা একটি মোটর বোটকে নৌকোর পাহারায় রেখে বাকি তিনটি বোটের সাহায্যে জাহাজটা প্রায় ঘেরাও করে ফেলল।

প্রলয় হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'ওরা যদি সমস্ত বিলিতি মাল জলে ডুবিয়ে দেয়?'

'সে চেষ্টা করতে পারে।' পদ্মনাভন ভ্রূ কোঁচকালেন। পরে বললেন, 'অনেক সময় তার দিয়ে বেঁধে মালের বাক্সটাকেই জলে নামিয়ে ফেলে। তারপর সুযোগমত ডোবানো মালপত্র ফের টেনে জাহাজে তোলে।'

মোটর বোটে দাঁড়িয়ে পদ্মনাভন জাহাজের ক্যাপ্টেনের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দিলেন। যে যেখানে রয়েছে যেন সেখানেই থাকে। শুল্ক বিভাগের অফিসাররা জাহাজটা তল্লাসী করে দেখবে।

বেগতিক দেখে ক্যাপ্টেন নিজেই ডেকে এসে দাঁড়ালেন। একটা কাঠের সিঁড়ি গা বরাবর নিচে নামিয়ে দেওয়া হল। মুসা আর পাঁচ-ছজন সশস্ত্র রক্ষী তখুনি উপরে উঠে গেল। প্রলয়, নাগরাজন আর সুশান্তও বোটে রইল না। পিছু পিছু পদ্মনাভনের সঙ্গে তারাও জাহাজের ডেকে পা বাড়াল।

ইতিমধ্যে রেডিও-টেলিফোনে সদর দপ্তরে খবর পৌছে গেছে।

মিনিট পনের-কুড়ির মধ্যে আরো দশ-বারো জন কাস্টমস অফিসারকে নিয়ে একটা লঞ্চ এসে জাহাজটার একপাশে দাঁড়াল।

প্রায় চার ঘণ্টা ধরে তল্লাসী,—করেন মাল প্রচুর ছিল। অন্ততঃ পঞ্চাশ-ষাট খানা ভি. সি. আর, শ'খানেক টি. ভি. সেট, অসংখ্য ক্যাসেট, সুগন্ধী সাবান, আরো নানা ধরনের বিলাসদ্রব্য এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি। এই সমস্ত ওই স্মাগলারদের হাতবদল হয়ে বন্দরের বাজারে চলে যেত। সেখান থেকে অন্যান্য রাজ্যে এবং ক্রেতাদের কাছে। শুধু সরকারী শুল্কের ন্যায্য পাওনা কোষাগারে জমা পড়ত না।

তল্লাসী শেষ হবার ঠিক আগে পম্‌পম্ এক খেল দেখিয়ে দিল। কি মনে হতে পদ্মনাভন হঠাৎ ওকে ছেড়ে দিলেন। এক রত্তি পুঁচকে কুকুরটা কেমন বিশ্রী কুঁই কুঁই শব্দ করে এগিয়ে চলল। আশ্চর্য ব্যাপার! পম্‌পম্ কারো কেবিনে কিংবা ডেকের দিকে একবারও পা বাড়াল না। ধীরে ধীরে এসে থামল বন্ধ এঞ্জিন ঘরটার সামনে। পদ্মনাভনের নির্দেশে এঞ্জিন ঘরের দরজা খোলা হল। ভিতরে ঢুকে পম্‌পম্ একটা পুরানো কোটের মতো জামা মুখে নিয়ে বেরিয়ে এল। সেটা হাতে রেখে পদ্মনাভন ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। জামাটার কাপড়ের ভিতরে সর্বত্র বেশ বড়ো মাপের বোতামের সাইজের কি যেন সেলাই করা। মুসা পকেট থেকে ছুরি বের করে দ্রুত সেলাইগুলি কেটে দিল। অমনি সোনার রঙের গোল গোল একরাশ বিস্কুট মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল।

পদ্মনাভন মন্তব্য করলেন, 'সোনা পাচারের এক নতুন কৌশল। এই জামাটা গায়ে দিয়ে অনায়াসে কোথাও নেমে যেতে পারত,—সন্দেহের অবকাশ ছিল না।'

তল্লাসী শেষ হতেই মুসা বাজেয়াপ্ত মালের একটা লিস্ট করে ফেলল। পদ্মনাভনের নির্দেশে জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং অন্যান্যদের সঙ্গে নৌকোর লোকগুলিকে মোটর বোটে তোলা হল। প্রলয়,

নাগরাজন আর সুশান্ত উঠল পদ্মনাভনের সঙ্গে,—আলাদা একটি বোটে।

তিন বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে মুসা বলল, 'তোমাদের ওই ইনফরমেশন ছিল, তাই আজকের অপারেশান সাকসেসফুল।' লঞ্চে তোলা বাজেয়াপ্ত মালের দিকে তাকিয়ে ফের মন্তব্য করল, 'নইলে লক্ষ লক্ষ টাকার মাল দিব্যি পাচার হয়ে যেত।'

পদ্মনাভন মুচকি হেসে বললেন, 'কবিতাটা কিন্তু ভারি সুন্দর লিখেছিল,—তাই না হে?'

সুশান্ত বলল, 'আমি ওর একটা অনুবাদ করে ফেলেছি,—বাংলায়।'

'তাহলে সেটা শোনাও।' নাগরাজন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলল।

সুশান্ত আবৃত্তি করল—

জাহাজটা নোঙর করে
দুই নট দূরে
সবুজ বাতিটা জ্বালো
জানাতে সবারে।
নিশীথের আগে এসো

হেথা সর্বজন
নগদেই মাল পাবে
এই জেনো পণ।

পদ্মনাভন আর মুসা কেউ বাংলা বোঝে না। তবু দুজনেই সপ্রশংস হাততালি দিল।

মোটর বোটগুলি প্রায় তীরে এসে ভিড়ছে।

সুশান্ত বলল, 'অপারেশান শেষ করে নিরাপদে ফিরেছি জানলে আঙ্কল আব্রাহাম দারুণ খুশি হবেন।'

ঈষৎ গম্ভীর মুখে পদ্মনাভন বললেন, 'অপারেশান কিন্তু এখনও শেষ হয় নি।'

মুসা অবাক। অনেকের মুখে চিন্তা,—আবার অপারেশান কোথায় ?

'সেটা তোমরাই বলবে।' পদ্মনাভন প্রশ্নটা প্রলয়ের দিকে ছুড়ে দিলেন।

মেধাবী ছাত্রের মতো প্রলয় চটপট উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, আরো একটা অপারেশান নিশ্চয় বাকি এবং সেটা হল অপারেশান হিলস্।'

দশ

ভোরের আলো সবে ফুটছে। পাখি ডাকছে। ঘাসে, সবুজ পাতায় টলটলে শিশির। পাহাড়ের ওপরে বেশ ঠাণ্ডা, কনকনে শীত না হলেও হাত-পা যেন অসাড় হয়ে আসে।

কাঠের ঘরের দরজাটা বন্ধ। গঞ্জালেশ ভিতরে কম্বল মুড়ি দিয়ে নাক ডাকাচ্ছে। শেষ রাত্তিরে ঘুম নাকি গাঢ় হয়। সম্ভবতঃ তাই এতগুলি মানুষের পায়ের শব্দেও সে জেগে ওঠে নি।

দেরি না করে পদ্মনাভন দরজায় ধাক্কা দিলেন। একবার, দুবার, ...শেষে তিনবার। কয়েক সেকেণ্ড না যেতেই ঘুম জড়ানো চোখে দরজা খুলে গঞ্জালেশ ঠিক ভূত দেখার মতো চমকে উঠে ফের তিন-পা পিছিয়ে গেল।

পদ্মনাভন বোধহয় ওর সঙ্গে মজা করছিলেন। জাঁতাকলে ইঁদুর পড়লে লোকে যেমন উল্লসিত হয়, অনেকটা তেমনি ভাব। এখন তো পালাবার পথ বন্ধ বাপু। মিছিমিছি ছটফট করে লাভ কি?

কিন্তু গঞ্জালেশ যে কত বড় ঘুঘু পদ্মনাভন নিশ্চয় সে কথা বুঝতে পারেন নি। হঠাৎ বাঁ দিকে একটু সরে গিয়ে একটা বাক্সের ডালা সে খুলে ফেলল। পিছন থেকে এক ধাক্কায় সেটা উল্টে দিতেই চারটি বিষধর সাপ ঈষৎ ফণা তুলে দরজার দিকে অগ্রসর হল। ভয় পেয়ে দলবল সুদ্ধ পদ্মনাভন প্রায় ছিটকিয়ে কাঠের ঘরটা থেকে দশ হাত পিছু হটে এলেন।

কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'মুর্খন, মুর্খন।'

সকলের নজর সাপগুলির ওপর। সেই মুহূর্তে গঙ্গালেশ তার শেষ চালটি দিল। এক লাফে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। কয়েক হাত দৌড়ে সোজা পথ ছেড়ে মুহূর্তে বাঁ দিকের ঢালু গা বরাবর নিচে নামতে শুরু করল।

বিষধর সাপ ফণা তুলে বেরুল।

পদ্মনাভন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মুসা হতবাক। লোকটা যেন সাপের মতো বিদ্যুৎগতিতে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সকলে দাঁড়িয়ে। শুধু সুশান্ত এক পলক চিন্তা করে তার কর্তব্য স্থির করে নিল। পরক্ষণেই বিপক্ষের পিছনে সে তীরবেগে ছুটল। পাহাড়ের গা বেয়ে গঙ্গালেশ নামছে, একই পথে সুশান্তও চূড়া থেকে।

ছুজনকেই মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে না। ঢালের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর উঠে সুশান্ত শূন্যে ঝাঁপ মারল। গঙ্গালেশ তখন খানিকটা নিচে। সুশান্ত তার ঘাড়ে পড়তেই ছুজনে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে গড়াতে লাগল। প্রলয় আর নাগরাজনও তৎক্ষণে নামতে শুরু করেছে। একটু সমতল জায়গা পেতেই গঙ্গালেশ উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু সুশান্ত তার পা ছুটো পেঁচিয়ে ধরে আছে। বিশেষ করে গঙ্গালেশের বাঁ পায়ে জোর নেই,—পা-টা তাই টেনে চলে, সুশান্ত আগেই লক্ষ্য করেছে।

মরীয়া হয়ে গঙ্গালেশ শেষ আঘাত হানল। হাতের কাছে একটা পাথর পেয়ে সেটা তুলে সুশান্তর মাথায় ঠুকতে গেল। কিন্তু প্রলয় সেই মুহূর্তে পৌঁছে গেছে। পাথরটা কেড়ে নিয়ে নাগরাজনের সাহায্যে শয়তানটাকে বাগে আনতে তার দেরি হল না। সুশান্ত ওর বাঁ পা-টা মুচড়ে দিতেই গঙ্গালেশ বেদনায় কাতরে উঠল। তিনজনে মিলে লোকটাকে কাবু করে হাঁপাতে লাগল। দলবল সহ পদ্মনাভন যখন এসে পেঁছিলেন তখন গঙ্গালেশ পর্যুদস্ত। কপালের কাছে বেশ খানিকটা কেটে গিয়ে দরদর করে রক্ত বেরুচ্ছে।

কাটাঙ্গালে পেঁছিতেই গাঁ ভেঙে সমস্ত লোক তাদের দেখতে এল। সুশান্তরও অবস্থা সঙ্গিন,—হাত-পা ছড়ে গেছে, জামাটা ফাটা—কনুয়ের কাছে ছেঁড়া। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা থেতলে রক্ত বেরুচ্ছে। পাহাড়ের গা বেয়ে অতখানি গড়িয়ে পড়া,—আরো সাঙ্ঘাতিক কিছু হতে পারত, হয়নি সেই ঢের।

ঘটনাটা পদ্মনাভন সকলকে বোঝালেন। এক চোরাচালান চক্রের বাস্তুঘুঘুরা মাল পাচারের উদ্দেশ্যে চমৎকার এক ফন্দি এঁটেছিল। পাহাড়ের মাথায় একটা লাল বাতি জ্বলত। তাই নিয়ে গাঁয়ের

মানুষের চিন্তাভাবনা ছিল না। এই কাজে গঞ্জালেশ ওদের পয়লা নম্বর সাগরেদ। কাঠের ঘর তৈরি করে একটা রিসিভিং সেট নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় ডেরা বেঁধেছিল। বাহরিন, দুবাই, মাসকট আরো সব উপসাগরীয় দেশ থেকে যে জাহাজ আসে তারাই আনে এই সমস্ত বিলাসদ্রব্য, এমন কি হেরোইন ইত্যাদির মতো সর্বনাশা মাদক। অগভীর আরবসাগরে জাহাজগুলি নোঙর ফেলে অপেক্ষা করে। আগেই ওয়্যারলেস রুম থেকে মেসেজ পাঠিয়ে দেয়। সেই খবর ধরে গঞ্জালেশ সবুজ বাত্তির নির্দেশ দিত। বহু দূর পর্যন্ত সেটা দেখা যায়। গ্রীন সিগন্যাল চোখে পড়লেই রাতের অন্ধকারে স্মাগলাররা তাদের নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়ত জাহাজের উদ্দেশ্যে। তারপর গোপন লেনদেন, জাহাজের মাল উঠত স্মাগলারদের নৌকোতে—হাতবদল হয়ে সেগুলি পেঁছিত বন্দরে,—সেখান থেকে ভারতের বড় বড় শহরে।

খবর শুনে আম্মা দৌড়ে এলেন। সঙ্গে নাগরাজনের ঠাকুমা। সমস্ত রাত্তির ঘুম হয় নি, চোখেমুখে উৎকণ্ঠা প্রকট। নাগরাজন, সুশান্ত আর প্রলয়কে বুকে টেনে নিয়ে আম্মা বললেন, 'ওরে দস্যি, রাত ভ'র তোরা ছিলি কোথায়?'

মুসা পরিহাস করল, 'দস্যি কেন হতে যাবে? বরং ওরা বীরপুরুষ,—আজকের হিরো।'

ঠাকুমা ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, 'গাল টিপলে দুধ বেরোয়। আর ওই ছেলে তিনটেকে তোমরা সমুদ্দুরে নিয়ে গিয়েছিলে?'

'নিয়ে যাব কেন?' পদ্মনাভন হেসে জবাব দিলেন, 'ওরাই তো জিদ করে আমাদের সঙ্গে গেল। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, ছেলেরা খবর না দিলে চোরাচালানীদের এত বড় গ্যাং-টা আজই ধরা পড়ত না।'

'শুধু দলের কথা কেন বলছেন?' মুসা প্রতিবাদ করল, 'কত লাখ টাকার জিনিসপত্র ধরা পড়েছে সেটা বলুন।'

'তা ঠিক।' পদ্মনাভন হাসলেন। বললেন, 'এই সাহসিকতার জন্য দেশের সরকার ওদের পুরস্কার দেবেন।'

'পুরস্কার পরে হবে স্যর।' মুসা ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, 'আগে চলুন প্রলয়ের রিসিভিং সেটটা কেমন দেখে আসি। নিজের হাতে নাকি ওটা তৈরি করেছে।'

সুশান্ত বলল, 'দিন রাত্তির তো ওই নিয়ে পড়ে আছে। বিজ্ঞানের পোকা ওর মাথায় সর্বদা কিলবিল করে।'

আম্মা হঠাৎ মুখখানা গম্ভীর করে বলল, 'কাল রাত্তিরে চোখে আর ঘুম এল না। ছেলেগুলোর জন্যে ভেবে মরি। এদিকে দুটো বাজতেই পেত্নীর কান্না,—সে তো আর থামতেই চায় না।'

এতক্ষণ প্রলয় একটি কথাও বলেনি। পেত্নীর প্রসঙ্গ উঠতেই সে এক পা এগিয়ে এসে বলল, 'কান্নাটা কিন্তু এখনই শুনিয়ে দিতে পারি।'

'ও আবার কি অলক্ষুণে কথা?' ঠাকুমা তাকে সাবধান করে বলল, 'ভূত-পেত্নীকে নিয়ে অমন ঠাট্টা-তামাশা করতে নেই ভাই। তেনারা শুনতে পেলে আবার—'

কিন্তু প্রলয়কে নিরস্ত করা গেল না। গঞ্জালেশের ঘর থেকে সকলের অলক্ষ্যে কখন যে একটা ছোট্ট টেপ রেকর্ডার আর ক্যাসেট সে সংগ্রহ করে নিয়েছে কেউ তা টের পায়নি। মেসিনটা চালু করতেই অনুনাসিক সুরে সেই কান্নাটা শুরু হল।

সকলে চুপ। এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে।

মিনিট তিন-চার পরে প্রলয় বলল, 'পেত্নীর কান্না-টান্না ডাহা মিথ্যে। সব ওই গঞ্জালেশের কারসাজি। রাত দেড়টা-দুটো হলেই টেপটা সে বাজিয়ে দিত। ওর কাছে একটা অ্যামপ্লিফায়ারও

আছে। তার সাহায্যেই কান্নাটা বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যেত। উদ্দেশ্য ছিল ভয় পেয়ে নিচের গ্রাম-গঞ্জের লোকেরা আর পাহাড়ে উঠতেই সাহস করবে না। তখন ওর পোয়াবারো। নিশ্চিন্তে লাল-সবুজ বাতি জ্বালিয়ে চোরাচালানের রমরমা ব্যবসা চালাবে।'

আম্মা এগিয়ে এসে প্রলয়কে জড়িয়ে ধরে বলল, 'সাবাস! গঞ্জালেশের ক্ষমতা কি তোমার বুদ্ধির সঙ্গে এঁটে ওঠে?'

সুশান্ত বলল, 'তোমার কাছে কিন্তু একটা অপরাধ করেছি আম্মা।'

'কি অপরাধ?' আম্মা শুধোল।

'তোমাকে লুকিয়ে তিনজনে মিলে পাহাড়ে উঠেছিলাম যে।' সুশান্ত সলজ্জ হাসল।

'ভাগ্যিস উঠেছিলে।' আব্রাহাম পিছন থেকে বললেন। 'তাই তো এত বড় একটা চোরাচালানীর দল ধরা পড়ল।'

'আর কথা নয়।' ভিড় সরিয়ে ঠাকুমা ওদের হাত ধরে বললেন, 'সমস্ত রাত্তির ঘুম নেই। তারপর ওই বদমাশটার সঙ্গে মারদাঙ্গা। এখন বাড়ি চল। স্নান-খাওয়া করে একটু সুস্থ হবে।'

গঞ্জালেশকে নিয়ে পদ্মনাভনের গাড়ি যাবার জন্য তৈরি। মুদ্দা তিন বন্ধুর সঙ্গে করমর্দন করল। পদ্মনাভন শুভেচ্ছা জানালেন। বললেন, 'আজকে রেস্ট নাও। কিন্তু কাল তোমাদের জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। কালিকটে বেড়াতে এসেছ, শহরটা একটু দেখে যাবে না?'

বাধা দিয়ে আম্মা সরব হল, 'আর ওদের চোখের আড়াল করছি নে। পরের ছেলেকে আগে তাদের মা-বাপের কাছে পৌঁছে দিই, তবে আমার ছুটি।'

'তাহলে আপনিও ওদের সঙ্গে আসুন।' পদ্মনাভনের সাদর আমন্ত্রণ।

আম্মার মুখে হাসি, ঠাকুমারও।

প্রলয়, সুশান্ত আর নাগরাজন হাত নাড়ছে।......

ধুলো উড়িয়ে গাড়ি চলে গেল। পিছন ফিরে প্রলয় একবার তাকাল পাহাড়ের চূড়ার দিকে।......

আজ সন্ধ্যায় লাল কিংবা সবুজ, কোনো আলো সেখানে দেখা যাবে না।

———